যাহারা নগ্ন দারিদ্র্য এবং সন্ন্যাসীর কঠোরতাকেই ভারতের সনাতন জাতীয় আদর্শ বলিয়া প্রচার করেন তাঁহারা রামায়ণ, মহাভারত ও কালিদাসের কাব্য অধ্যয়ন করিলে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবেন। অধ্যাত্মিকতা ভারতের সনাতন আদর্শ সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু, তাই বলিয়া ভারত জীবনের আনন্দকে, সৌন্দর্য্যকে, ইন্দ্রিয়ভোগকেও অবহেলা করে নাই—এবং যদিও ভারত কখনও অতিমাত্রায় সন্ন্যাসের দিকে, কখনও তাহার বিপরীত দিকে ঝুঁকিয়াছে তথাপি এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনই হইয়াছে ভারতের চিরন্তন প্রয়াস। কালিদাসের যুগে ভারত ভোগবিলাসের চূড়ান্ত করিয়াছিল—কিন্তু তখনও আধ্যাত্মিকতাকে ভুলিয়া যায় নাই, পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার ন্যায় কামোপভোগকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই। ভোগ যেন ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থ ও কাম যেন ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই ভাবে মানুষ মানবজীবনের পরম লক্ষ্য মোক্ষ বা দিব্য অধ্যাত্ম জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে সে-বিষয়ে ভারতবাসী সকল সময়েই সজাগ—কালিদাসের কাব্যে সর্বত্র এই অধ্যাত্ম আদর্শটি প্রচার করা হইয়াছে। রঘুবংশের প্রারম্ভে সূর্য্যবংশীয় আদর্শ নরপতি দিলীপের বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন,

জুগোপাত্মনমত্রস্তো ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোহর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ ॥১।২১

তিনি ভীত না হইয়া আত্মরক্ষা, আতুর না হইয়া ধর্ম্মাচরণ, লোভী না হইয়া অর্থগ্রহণ এবং আসক্ত না হইয়া বিষয় সম্ভোগ করিতেন।

অনাকৃষ্টস্য, বিষয়ৈর্বিদ্যানাং পারদৃশ্বনঃ।
তস্য ধর্ম্মরতোরাসীদ্ বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা ॥ ১।২৩

তিনি যুবা হইলেও বিষয়ের মোহে আকৃষ্ট ছিলেন না, বেদ-বেদাঙ্গাদি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এই সকল কারণে জরা ব্যতিরেকেও তাঁহার বার্দ্ধক্য (প্রবীণতা) ঘটিয়াছিল।

স্থিতৈঃ দণ্ডয়তে দণ্ড্যান্ পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে।
অপ্যর্থকামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম্ম এব মনীষিণঃ ॥১।২৫

তিনি লোকরক্ষার্থে দণ্ডনীয় ব্যক্তিগণের দণ্ড বিধান করিতেন এবং সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার অর্থ ও কাম এই উভয়ই ছিল ধর্ম্ম আর্থৎ তাঁহার রাজ্যশাসন ও বিষয় সম্ভোগ ধর্মের অনুগত হওয়ায় তাহা বস্তুতঃ ধর্মই ছিল,—তাঁহার মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ বস্তুতঃ এক বর্গে, ধর্মে, পরিণত হইয়াছিল।

এই যে ধর্মের অনুগত অর্থ ও কাম, জীবনের সকল কর্ম ও ভোগকে আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করা এইটিই ভারতের চিরন্তন আদর্শ। রাজ্যশাসনের ন্যায় বহুমুখী বিবাট কর্ম যদি অনাসক্তভাবে, অধ্যাত্ম ভাবে করা যায় তাহা হইলে সাধারণ সাংসারিক জীবনও যে অধ্যাত্মভাবাপন্ন হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বস্তুতঃ এইটিই গীতার আদর্শ, কালিদাস তাঁহার কাব্যের ভিতব দিয়া আপন ভাবে এই আদর্শই প্রচার করিয়াছিলেন। কেমন করিয়া এই অনাসক্ত ভাব লাভ করা যায় কবি আদর্শ নৃপতি দিলীপের বর্ণনাতেই তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রথমতঃ চাই বেদ-বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়া মানব-জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়া। দ্বিতীয়তঃ চাই বেদ ও উপনিষদেব শিক্ষা অনুযায়ী সাধনা কবিয়া চবিত্রকে সুগঠিত করা এবং ইহাই ধর্ম আচবণ নামে অভিহিত—মহারাজা দিলীপ ধর্ম আচরণ যতই কঠিন বা কষ্টকব হউক তাহাতে কখনও আতুব হন নাই।

কালিদাস ছিলেন শিল্পী, কবি—জীবনের সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্যের দিকেই ছিল তাঁহার দৃষ্টি—একদিকে সকল প্রকাব ভোগবিলাসময় জীবন, অন্যদিকে সন্ন্যাসীর ত্যাগ ও সংযম, দুই-ই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে—দুইয়েব মধ্যেই তিনি সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, এবং জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সমগ্র দৃষ্টিতে যেমন গার্হস্থ্য আশ্রম তেমনিই বাণপ্রস্থ আশ্রমও যথাযথ স্থান পাইয়াছে এবং উভয়ের বর্ণনাতেই তিনি অপূর্ব কবিত্বশক্তির পবিচয় দিয়াছেন। সূর্য্যবংশীয় নৃপতি-গণ যৌবনে পূর্ণভাবে জীবনকে উপভোগ কবিতেন কিন্তু সকলেই পরিণত বয়সে গুণবান পুত্রের হস্তে বাজ্যলক্ষ্মীকে অর্পণ কবিয়া বল্কলধারী সন্ন্যাসী-দের পদানুসবণ করিতেন। সংসারেব অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা স্বর্গসুখকেও তুচ্ছ করিয়া মোক্ষ লাভেব জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপে সন্ন্যাস ও মোক্ষই ছিল জীবনসৌধেব চূড়াস্বরূপ। কবির শিল্প-দৃষ্টি নানারূপ বিরোধী বস্তু ও গুণসকলেব মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয়ের সূত্র-বাহির করিয়া তৃপ্ত হইত—এইভাবে তিনি আধ্যাত্মিকতা ও জীবনের সম-ন্বয় করিয়া তাঁহার কবিসুলভ সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহাদিসঙ্কুল রাজধানী হইতে অনতিদূরে অবস্থিত শান্ত সিদ্ধাশ্রমের পরি-কল্পনা তাঁহার কাব্য ও নাটককে সমৃদ্ধ করিয়াছে। মহারাজা সুষেণের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন,

নীপান্বয়ঃ পার্থিব এষ যজ্বা,
গুণৈর্যমাশ্রিত্য পরস্পরেণ

সিদ্ধাশ্রমঃ শান্তমিবত্যৈ
সত্ত্বৈর্নৈসর্গিকোঽপ্যুৎসসৃজে বিরোধঃ ।।
—রঘুবংশ ৬।৪৬

শান্ত সিদ্ধাশ্রমে যেমন আজন্মবিরোধী হিংস্র জন্তুগণ পরস্পরের মধ্যে চিরন্তন বিবোধ পরিহার পূর্বক বন্ধুভাবে বাস করে, জ্ঞান-মৌন, শক্তি-ক্ষমা, ত্যাগ-গর্বহীনতা প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী গুণরাশিও তদ্রূপ তাঁহার দেহে বিরুদ্ধভাব ত্যাগ করিয়া সোদরবৎ বন্ধুভাবে বাস করিতেছে।

কালিদাস কবিদৃষ্টিতে অনুভব করিয়াছিলেন যে, সংসারের সকল দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্যে ঐক্য সূত্র আছে, সেইটিকে ধরিয়াই সকল দ্বন্দ্ব ও সমস্যার সমাধান করা যায়—কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা কিরূপে সংসাধিত হইবে তাহাব কোন সুস্পষ্ট সন্ধান তিনি দেন নাই। তাঁহার পরিকল্পনা এই যে, শান্ত উপবনে মুনি ঋষিরা যদি তপস্যায় নিযুক্ত থাকেন এবং গৃহস্থ রাজন্য-বৃন্দের গুরুরূপে তাঁহারা সাংসারিক জীবনের অভ্যুদয়ে সাহায্য করেন, ব্রহ্ম-তেজের দ্বারা ক্ষত্রিযতেজকে সমর্থন করেন তাহা হইলেই মানুষের সাংসারিক ও সামাজিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পবিচালিত হয়। মহারাজা দিলীপ কুলগুরু বশিষ্ঠের শান্ত আশ্রমে গিয়া বলিয়াছিলেন,

পুরুষায়জীবিন্যো নিরাতঙ্কা নিরীতয়ঃ।
যন্মদীয়াঃ প্রজাস্তস্য হেতুস্ত্বদ্‌ব্রহ্মচর্চসম্ ।।১।৬৩

—"আপনার ব্রহ্মতেজেব বলেই আমার প্রজাপুঞ্জ শতবর্ষ জীবিত থাকে এবং অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি সর্ববিধ আতঙ্ক-পরিশূন্য হইয়া নির্ভয়ে কালাতিপাত করে।" সাংসারিক জীবনের উপর আশ্রম জীবনের এই প্রভাব ভাবতে চিরদিনই স্বীকৃত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে মহারাষ্ট্র-নেতা শিবাজী তাঁহার গুরু রামদাসের নির্দ্দেশ ও অধ্যাত্মবল সহায়ে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া শক্তিশালী রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। কালিদাস রাজ্যকেও একরকম আশ্রম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—

পপ্রচ্ছ-কুশলং রাজ্যে রাজ্যাশ্রম মুনিং মুনিঃ ।১।৫৮

—গুরুদেব বশিষ্ঠ রাজ্যরূপ আশ্রমের মুনিস্বরূপ দিলীপকে রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

সাংসারিক জীবনের সহিত অধ্যাত্ম আশ্রমের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় ভারতবাসীর সাধারণ জীবন যে অনেকটা অধ্যাত্মভাবাপন্ন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি মানুষের জীবন হইতে পাপ তাপ দ্বন্দ্ব দুঃখ দূর হয় নাই, আর অত্যুচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শের অনুসরণ করা সত্ত্বেও ভারতবাসী

আজ যে দীন হীন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাতে লোকে আধ্যাত্মিকতার উপযোগিতা সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতার দ্বারা সাংসারিক জীবনকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য জীবনে পরিণত করিবার যে আদর্শ বৈদিক যুগে প্রচারিত হইয়াছিল—আজ পর্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, কারণ ঐ আদর্শটি সম্বন্ধেই ভারতবাসী আজ পর্যন্ত ঠিক মত সজাগ ও সজ্ঞান হইতে পাবে নাই। কালিদাসের কাব্যেই আমরা তাহা দেখিতে পাই। মানুষ যে দেহ, মন, হৃদয়, মস্তিষ্কের বিকাশ ও অনুশীলনে কত উচ্চে উঠিতে পারে, দেবতুল্য হইতে পাবে, কালিদাস রঘুবংশে তাহা সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আবার সেই সঙ্গেই দেখাইয়াছেন যে, এই সংসার অনিত্য অসার, রঘুবংশের ন্যায় পুণ্যময় ও প্রতাপশালী বংশেও পাপ প্রবেশ করে, নিয়তির বশে, কালের বশে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অতএব যাহারা শান্তিপথের পথিক, পরম মঙ্গল চান তাঁহারা গৃহস্থ আশ্রমে থাকেন না। কালিদাসের সময়ে ভারতবাসীর প্রাণশক্তি সতেজ ছিল, তাই এইরূপ সংসারত্যাগের আদর্শ বেশী লোককে প্রভাবিত করিতে পারে নাই, জীবনে যে সুখ আছে, সৌন্দর্য্য আছে, তাহার বিকাশ ও উপভোগ করিবার দিকেই সাধারণে মন দিয়াছিল। কিন্তু জাতীয় জীবনশক্তি যখন কালক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল সেই সন্ধিক্ষণে আচার্য্য শঙ্কর আসিয়া সংসারের অনিত্যতার উপর জোর দিলেন, সন্ন্যাসের আদর্শ বহুলভাবে প্রচার করিলেন।

গীতা ঠিক এইটিরই প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াছিল। গীতাও সংসারকে অনিত্য বলিয়াছে—কিন্তু তাহা সংসারকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য নহে, আমাদের মধ্যেই যে নিত্যবস্তু আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত যুক্ত হইবার জন্যই গীতা সংসারের অনিত্য বস্তু হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে বলিয়াছে। একবার আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের যে নূতন দৃষ্টি খুলিয়া যায় তাহাতে সংসারকে, জগৎকেও আমরা নূতন চক্ষুতে দেখিতে পাই—তখন আর তাহা অনিত্য অসার বলিয়া উপলব্ধ হয় না, তখন তাহা নিত্য বস্তু আত্মা বা ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি বলিয়া অনুভূত হয়, বাসুদেবঃ সর্বম্—তখন আর সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাতীত ব্রহ্মে লীন হইবার কোন তাগিদ থাকে না—এই সংসারে থাকিয়া সকল বস্তু, সকল ঘটনার ভিতর দিয়াই ব্রহ্মের সহিত, ভগবানের সহিত মিলন-সুখ অনুভব করা যায়—এই ষষ্ঠ অধ্যায়েই গীতা তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়াছে (৬।২৯—৩২)। আর এই অধ্যাত্ম ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই গীতা সতত আত্মার সহিত যোগ অভ্যাস করিতে বলিয়াছে (৬।১৫,২৮)।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, পরে যাহাই হউক অন্ততঃ যোগ অভ্যাসের সময় সংসার হইতে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক হয় কি না। গীতা বলিয়াছে নির্জন স্থানে একাকী বসিয়া ধ্যান করিতে হইবে—শুধু ইহা হইতেই শঙ্করের ন্যায় সিদ্ধান্ত করা ঠিক হয় না যে, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে। স্থিতপ্রজ্ঞ মুক্ত ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া সকল কর্ম করিবেন—ইহাই গীতার শিক্ষা। কিন্তু একবার সন্ন্যাসী হইলে আর সংসারের কর্মে ফিরিয়া আসা চলে না, জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই এইরূপ অভিমত, এরূপ প্রত্যাবর্তন শাস্ত্র ও শিষ্টাচারের বিরোধী (ব্রঃসূঃ ৩।৪।৪০)। অতএব যোগসাধনার জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন আবশ্যক ইহা গীতার অভিমত হইতে পারে না। তাহা ছাড়া গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে, পরিমিত আহার, বিহার ও কর্ম না থাকিলে যোগ সুগম হয় না। অতএব সংসারের কর্মের মধ্যে থাকিয়াই যোগ সাধনা করিতে হইবে। সংসারে থাকিয়াও কিছু সময়ের জন্য নিয়মিত ভাবে নির্জনে বসিয়া প্রত্যহ ধ্যান অভ্যাস করিতে হইবে—ইহাই গীতার অভিমত বলিয়া মনে হয়। রামানুজও এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, অহরহ যোগকালে। কিন্তু বর্তমানে মানুষের সাংসারিক জীবনে যেরূপ রাজসিকতার ও তামসিকতার প্রাবল্য—এইরূপ সংসারে থাকিয়া যোগসাধনায় সাফল্য লাভ করিবার আশাও দুরাশা। অতএব সংসারের মধ্যেই যদি এমন আশ্রম রচনা করা যায় যেখানকার পরিবেষ্টনী সাধারণ সাংসারিক জীবন হইতে ভিন্ন, অধ্যাত্ম সাধনার অনুকূল—সেইখানে থাকিয়াই প্রকৃষ্টভাবে যোগসাধনা করা যাইতে পারে। কালিদাস যে বশিষ্ঠ, কণ্ব প্রভৃতি মুনির আশ্রম, বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এইরূপই আশ্রম, সন্ন্যাস আশ্রম নহে। গিরিগুহায় অসহায়ভাবে থাকিলে একদিকে যেমন একাগ্রতার সুবিধা হয়, অন্যদিকে তেমনই অসুবিধাও আছে—শরীররক্ষার জন্য আহারাদির চেষ্টায় মনের বিক্ষেপ হয়, হিংস্র জন্তু হইতে আক্রমণের আশঙ্কায় মনের বিক্ষেপ হয়। অতএব সুরক্ষিত আশ্রমে নিশ্চিন্ত হইয়া সাধনা করিবার সুযোগ পাইলেই সিদ্ধিলাভ সুগম হয়। ব্রহ্মসূত্রেও বলা হইয়াছে, যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ (৪।১।১১)—দিক, দেশ, কাল বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, চিত্তের একাগ্রতারূপ প্রয়োজনই নিয়ম—যেখানে থাকিলে চিত্তের একাগ্রতা সাধনে সুবিধা হয় সেইখানে থকিয়াই যোগসাধনা করা বিধেয়। সন্ন্যাস অবলম্বনে প্রস্তুত মহারাজা রঘু পুত্রের অনুরোধে বনে না যাইয়া নগরের উপকণ্ঠে এক নির্জন স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং কালিদাস তাঁহার যে যোগ অভ্যাসের বর্ণনা দিয়াছেন তাহা গীতার বর্ণনারই অনুরূপ। গীতা

যোগীর সমতা বর্ণনা করিতে সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন শব্দটি দুইবার ব্যবহার করিয়াছে—কালিদাসও অনুরূপ শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন,

রঘুরপ্যজয়ৎ গুণত্রয়ং প্রকৃতিস্থং সমলোষ্ট্রকাঞ্চনঃ। ৮।২১

তবে কালিদাস যোগসাধনাকে নিবৃত্তি ধর্ম বলিয়াছেন, প্রবৃত্তি ধর্ম হইতে পৃথক করিয়াছেন—ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কালিদাসের যুগে গীতার কর্মযোগের আদর্শটি ভারতবাসী কর্তৃক গৃহীত হয় নাই—পরে শঙ্কর কর্তৃক সন্ন্যাস প্রচারে তাহা আরও চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কালিদাস অনাসক্ত ভাবে কর্ম ও ভোগের কথা বলিয়াছেন, এ-আদর্শ ভারতে নূতন নহে, বৈদিক যুগ হইতেই প্রচারিত। কিন্তু অনাসক্তভাবে কর্ম করিলে যখন তাহা কোন-রূপ বন্ধনের সৃষ্টি করে না, তখন শেষ বয়সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া, কর্মত্যাগ করিয়া বনে যাইবার সার্থকতা কি? এ-সংসার অসার, এখানকার ভোগসুখ-সকল তুচ্ছ, বিশ্বের অতীতে নির্গুণ নীরব ব্রহ্মে বা শূন্যে বিলীন হওয়াই মানব জীবনের চরম সার্থকতা—এই দার্শনিক মতবাদই সন্ন্যাসকে প্রশ্রয় দিয়াছে। ইহার বীজ উপনিষদের মধ্যে থাকিলেও বৌদ্ধরাই এই মতটি বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছিলেন—কালিদাস এবং তাঁহার যুগের দার্শনিক চিন্তার উপর আমরা এই বৌদ্ধপ্রভাবই দেখিতে পাই। তথাপি এই দার্শনিক মতবাদ সাধারণতঃ সেই যুগের লোককে কর্মবিমুখ, ভোগ-বিমুখ কবিতে পারে নাই—সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাস কেবল দর্শনে এবং কাব্যে একটা আদর্শ মাত্রই ছিল, তাহা লোককে তাহাদের সাংসারিক ভোগ ও কর্মের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা স্মরণ করাইয়া দিত, এইভাবে সকল ভোগ ও কর্মের মধ্যেও একটা অনাসক্তভাব সাধারণ ভারতবাসীর আয়ত্ত হইয়াছিল।

কালিদাস কাব্যই রচনা করিয়াছিলেন, দর্শন শাস্ত্র নহে। কাব্যেরই একটি অঙ্গ হিসাবে তিনি সাময়িক দার্শনিক মত ও অধ্যাত্ম সাধনার অব-তারণা করিয়াছিলেন। ঐ যুগের দার্শনিক চিন্তাধারা ও অধ্যাত্ম সাধনার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে। ঐ বিরাট উপাদেয় গ্রন্থখানি কতক অংশে গীতার অনুকরণে রচিত, গীতার শিক্ষার সহিত উহার অনেক মিল আছে। বস্তুতঃ গীতা ও যোগবাশিষ্ঠ উভয়েই হইতেছে বৈদান্তিক গ্রন্থ, অতএব এখানে যোগবাশিষ্ঠ সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যৌবনে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া দেশের সম্মুখে যে বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, মূলতঃ তাহারই প্রতিরোধ করিতে গীতাকার রাজপুত্র অর্জুনের বিষাদকে উপলক্ষ্য করিয়া অভিনব কর্মযোগের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। ঐরূপ যোগবাশিষ্ঠকারও রামচন্দ্রের বিষাদ

ও বৈরাগ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। অর্জুনের প্রশ্ন ছিল কর্মের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়, না, কর্মত্যাগের দ্বারা। যোগবাশিষ্ঠ গীতারই ন্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, সিদ্ধিলাভের জন্য কর্মত্যাগের প্রয়োজন নাই। তবে গীতা কর্মকে যে উচ্চ মূল্য দিয়াছে যোগবাশিষ্ঠ তাহা দেয় নাই। যোগবাশিষ্ঠের মতে একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়, কর্ম বা ভক্তি হইতেছে গৌণ উপায়—এ-বিষয়ে ব্রহ্মসূত্র, পাতঞ্জল প্রভৃতিরই সহিত যোগবাশিষ্ঠের মিল আছে। বস্তুতঃ গীতা যেমন কর্মকে উচ্চ স্থান দিয়াছে এমনটি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য মীমাংসকেরা কর্মকেই সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায় বলিয়াছেন, এবং জ্ঞানকে কর্মেরই একটি অঙ্গ বলিয়াছেন, এবং এই ভাবে বস্তুতঃ তাঁহারাই গীতার কর্মযোগেব ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কর্ম বলিতে বুঝিয়াছেন কেবল বেদবিহিত আনুষ্ঠানিক অগ্নিহোত্রাদি যাগযজ্ঞ। কিন্তু গীতা কর্ম শব্দ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্মকেই গ্রহণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, ভগবানে উৎসর্গ করিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম সম্পন্ন করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান ও ভক্তিরও বিকাশ হয় এবং তিনে মিলিয়া প্রকৃষ্টভাবে সিদ্ধি আনিয়া দেয়। যোগবাশিষ্ঠের মতে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে, বিচারের দ্বারা তত্ত্ব অধিগত করিয়া যোগসাধনার দ্বারা চিত্তকে স্থির করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে—ইহা ছাড়া সিদ্ধিলাভের অন্য পন্থা নাই; বশিষ্ঠ মানুষকে নিজের চেষ্টা ও পুরুষকারের উপরেই নির্ভর করিতে বলিয়াছেন, গুরুর উপরে নহে, ভগবানের উপরেও নহে— এখানে আমরা যোগবাশিষ্ঠের উপর বৌদ্ধমতেরই প্রভাব দেখিতে পাই। অন্যপক্ষে গীতার শিক্ষা গুরুরূপী ভগবানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা, আর যতদিন মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের নিকট সমর্পণ করিতে না পারিতেছে ততদিন নিজের চেষ্টার দ্বারা সেজন্য প্রস্তুত হইয়া উঠা। নিজের চেষ্টা ও পুরুষকারের পরম পরিণতি হইতেছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করা। যোগবাশিষ্ঠ এই মত গ্রহণ করে নাই। বশিষ্ঠ রামকে বলিতেছেন—"বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক বারংবার অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়-ভুজঙ্গকে বশে স্থাপন করিয়া আত্মা যাহা পাইতে পারে না, তাহা ত্রিজগতে পাওয়া যায়না।...যাহারা সম্যক শাস্ত্রালোচনা, রীতিমত চেষ্টা ও বিচারে পরাঙ্মুখ (ভয়ে তাহাতে অগ্রসর হয় না) সেই মূর্খদিগের শুভপথে প্রবৃত্তি উৎপাদনার্থ বিষ্ণুভক্তির কল্পনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে অভ্যাস ও যত্ন এই দুইটি প্রথম ও মুখ্য বিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। অক্ষম স্থলে পূজ্য-

পূজকভাব (বিষ্ণুর পূজা করা—বিষ্ণুভক্তি) গৌণকল্প করা হইয়াছে। ···হৃদয়গুহাবাসী সনাতন চৈতন্যতত্ত্বই আত্মার মুখ্য শরীব, হস্তে শঙ্খচক্র-গদাধারী তদীয় বহির্মূর্তি গৌণ (মায়ারূপে কল্পিত আগন্তুক)·· হে রঘুনন্দন! যে আত্ম-বিবেকের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন ও মোহমগ্ন চিত্তের বশীভূত হইয়া এই চমৎকার আত্মতত্ত্বজ্ঞান মনে স্থাপিত কবিতে না পারে, সেই অস্থিরচিত্ত-ব্যক্তি শঙ্খচক্রগদাধারী পরমেশ্বরের বহির্মুর্তির পূজা করিবে।" (৫।৪৩)

এখানে ভগবানের সাকাররূপকে মায়াকল্পিত বলা হইযাছে এবং সাকারোপাসনাকে নিম্নস্থান দেওয়া হইয়াছে—ইহা গীতার শিক্ষাব বিপরীত। উপনিষদে ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ দুই-ই বলা হইযাছে, তাহাব সগুণরূপটি যে মায়া-কল্পিত এই মতটি যোগবাশিষ্ঠ পাইয়াছে বৌদ্ধগণেব নিকট হইতে, বৌদ্ধমতে সংসাবের সকল নামরূপই হইতেছে মনেব স্বষ্টি, কল্পনা মাত্র। শঙ্করাচার্য্য যোগবাশিষ্ঠ হইতেই এই মত গ্রহণ কবিযাছিলেন বলিযা মনে হয়। যোগবাশিষ্ঠেব মধ্যে আমরা দেখি বেদান্তেব ব্রহ্ম এবং বৌদ্ধগণের শূন্য বা বিজ্ঞানের সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছে এবং ইহারই পরিণতি হইযাছে শঙ্করের মায়াবাদ। শঙ্করের যে বিখ্যাত দৃষ্টান্ত, রজ্জুতে সর্পভ্রম, নিবাকাব নিষ্ক্রিয় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই আছেন, রজ্জুতে সপের ভ্রমেব ন্যায় ব্রহ্মেতে জগৎ ভ্রম হয়, এই দৃষ্টান্তটিও যোগবাশিষ্ঠ হইতেই গৃহীত—

যথা রজ্জ্বাং ভুজঙ্গত্বম্ মরাম্বুমতির্যথা।
মিথ্যাবভাস: স্ফুরিত তথা মিথ্যাপ্যহংকৃতি॥

৬ (১)।১১১।১৪

অন্যত্র বলা হইয়াছে, "যখন ব্রহ্ম একমাত্র মনঃস্বরূপ, পৃথ্ব্যাদি স্বরূপ নহেন, তখন এই সমুদয় বিশ্ব মনঃস্বরূপই জানিবে অর্থাৎ ইহাতেও বাস্তবিক আধিভৌতিক ভাব নাই। মনই সঙ্কল্পনগরের ন্যায় ও গন্ধর্বপুরেব ন্যায় মিথ্যাভূত এই বিশাল প্রপঞ্চ বিস্তার করিয়াছে। রজ্জুতে সপত্বের ন্যায় বাস্তবিক আধিভৌতিকতা তাহাতে নাই।" (৩।৩) শঙ্করের অদ্বৈত ও মায়াবাদ বুঝাইতে বিদ্যারণ্য পঞ্চদশীতে যোগবাশিষ্ঠ হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই যে মত, জগৎ অলীক—এইটি বৌদ্ধমত, ব্রহ্মসূত্রে এই মত খণ্ডন করা হইয়াছে। জগতের অলীকতা বুঝাইতে যোগ-বাশিষ্ঠ যে-সব উপমা প্রয়োগ করিয়াছে তাহার একটিও উপনিষদের মধ্যে পাওয়া যায় না, ঐ-সব দৃষ্টান্ত বৌদ্ধ-দশন হইতেই গৃহীত। যোগ-বাশিষ্ঠের কয়েকটি উপমা—"মানস পূজাকালে কল্পিত রত্নপ্রসাদ প্রভৃতি,

মনঃকল্পিত রাজ্য, ইন্দ্রজাল-রচিত মালা, উপন্যাসের ঘটনা, বায়ুরোগ বশতঃ ভূমিকম্প, শিশুবিভীষিকার জন্য কল্পিত ভূত, নির্মল আকাশে বিলম্বিত মুক্তামালা, নৌকারোহীর দৃষ্টিতে তীরস্থ বৃক্ষের প্রচলন, স্বপ্নদৃষ্ট নগরী এবং মনঃকল্পিত আকাশকুসুমের ন্যায় জগৎ-সংসারও অলীক।" (২।৩।১১)। ব্রহ্ম হইতে জগতের উদ্ভব বুঝাইতে এরূপ কোন দৃষ্টান্ত উপনিষদ বা ব্রহ্মসূত্রে কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। অবশ্য ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় যোগবাশিষ্ঠ শ্রুতিকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই।* সত্যজ্ঞানের জন্য যোগবাশিষ্ঠ যুক্তিবিচার ও নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরেই নির্ভর করিয়াছে—

প্রমাণমেকমেবেহ প্রত্যক্ষং তদতঃ শৃণু ॥২।১৯।১৬
ন্যায়েনেতি পরামর্শো বিচার ইতি কথ্যতে।
বিচারাৎ জায়তে তত্ত্বং তত্ত্বাদ্বিশ্রান্তিরাত্মনি ॥—২।১৪।৫০—৫৩

ন্যায়সঙ্গত তর্ক ও যুক্তিকে যোগবাশিষ্ঠ খুবই উচ্চ স্থান দিয়াছে—যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। "যে-শাস্ত্র যুক্তিদ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের অনুকূল, তাহা মানুষ-প্রণীত হইলেও গ্রাহ্য। আর যাহা সেরূপ নহে এমন শাস্ত্র বেদের অন্তর্গত হইলেও উপাদেয় নহে। ফলে ন্যায়সম্বলিত মার্গ সেবা করাই লোকের উচিত। যুক্তিযুক্ত বাক্য বালকের নিকট হইতে গ্রহণ করা উচিত। ব্রহ্মা-কর্তৃক কথিত হইলেও অযুক্ত বাক্য তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করা উচিত। যে-ব্যক্তি অগ্রবর্তী গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া, ইহা আমার পিতার কূপ বলিয়া কূপোদক পান করে, তাদৃশ অত্যানুরাগী ব্যক্তিকে কে উপদেশ দিবে?" (২।১৮।১-৫)

এই যে এখানে বেদাদি শাস্ত্রের উপরেও তর্কবুদ্ধিকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে ভারতীয় মনের ক্রমবিবর্তনই দেখা যায়। পূর্ববর্তী যুগে বোধিকেই (Intuition) উচ্চতম স্থান দেওয়া হইয়াছে, যুক্তিতর্ককে নহে—শ্রুতিতে এই বোধিমূলক জ্ঞান সংগৃহীত আছে বলিয়াই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র শ্রুতিকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হইতেছে বৌদ্ধদর্শন, সেখানে বেদের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ বিদ্রোহ এবং তর্কযুক্তিরই প্রাধান্য। মানুষের মানবীয় চিত্তের পূর্ণবিকাশে যেমন বোধিশক্তির বিকাশ প্রয়োজন, তেমনই তর্কশক্তির বিকাশও প্রয়োজন, তাই বোধিমূলক যুগের পর আসিয়াছে যুক্তিপ্রধান যুগ, বেদ ও উপনিষদের পর আসিয়াছে দর্শনশাস্ত্র। তথাপি ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় যুক্তিমূলক শাস্ত্রেও শ্রুতিকেই অনুসরণ করিয়া তথ্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। গীতা শ্রুতির

---

* এ-বিষয়েও আমরা যোগবাশিষ্ঠের উপর বৌদ্ধপ্রভাবই দেখিতে পাই।

উপর নির্ভর না করিয়া, সকল শ্রুতির যে মূল উৎস অন্তর্বোধ তাহারই উপর নির্ভর করিয়াছে, এবং সেই অন্তর্বোধ লাভের উপায়স্বরূপ মনবুদ্ধির যুক্তিতর্ককে যোগসাধনার দ্বারা নিশ্চল করিতে বলিয়াছে—

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥২।৫৩

গীতা স্বীকার করিয়াছে বেদ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের গ্রন্থ, সর্বৈ বেদৈরহমেবো বেদ্যঃ, যোগবাশিষ্ঠের ন্যায় গীতা বলে নাই যে, যুক্তিতর্কের দ্বারা বেদের সত্যাসত্য বিচার করিতে হইবে—যোগলব্ধ অন্তর্জ্ঞানের আলোকেই সকল সত্য যাচাই করিতে হইবে। যোগবাশিষ্ঠ যুক্তিকে যে বেদের উপরে স্থান দিয়াছে ইহাতে বৌদ্ধপ্রভাব এবং যুগপরিবর্ত্তনের প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। এই হিসাবেও যোগবাশিষ্ঠ অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ এবং শঙ্করও যুগান্তরের এই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি যোগবাশিষ্ঠের ন্যায় অমন প্রকাশ্যভাবে যুক্তিতর্ককে বেদউপনিষদের উপর স্থান দেন নাই, কিন্তু নিজের মতানুযায়ী ঐ সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া কার্য্যতঃ তিনি তাঁহার তর্কবুদ্ধিকেই শাস্ত্রের উপরে স্থান দিয়াছেন। অবশ্য ইহার পশ্চাতে ছিল তাঁহার নিজের অধ্যাত্ম অনুভূতি। তিনি নিজে পরমতত্ত্বকে যে-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেইটিই যে বেদাদিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তাহা দেখাইতে তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

যোগবাশিষ্ঠ যুক্তিকে উচ্চস্থান দিলেও, তাহার মধ্যে দার্শনিক সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক খুব কমই আছে। গ্রন্থকার নিজ সিদ্ধান্তগুলি কথা ও কাহিনীর মধ্য দিয়া সরস শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে খুবই উপযোগী হইয়াছে। সেইজন্যই এককালে যোগবাশিষ্ঠের বহুল প্রচার হইয়াছিল। সেই যুগের দার্শনিক চিন্তাধারা এবং যোগসাধনায় যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ছিল যোগবাশিষ্ঠ সবেরই পরিচয় দিয়াছে। তবে গীতার মধ্যে যেমন সকল মত, সকল সাধনার গভীর সমন্বয় দেখা যায় যোগবাশিষ্ঠের মধ্যে তাহা নাই—যোগবাশিষ্ঠের মধ্যে সব যেন একাকার হইয়া আছে, তাই দেখা যায় তাহার এক স্থানের বক্তব্যের সহিত অন্য স্থানের বক্তব্যের বিরোধ রহিয়াছে। তবে মোটের উপর যোগাবাশিষ্ঠের একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মত আছে এবং সেইটি হইতেছে বৌদ্ধ চিন্তাধারা এবং বেদান্তের ব্রহ্ম তত্ত্বের সংমিশ্রণ। বৌদ্ধরা যে চিৎ বা বিজ্ঞানকেই পরমতত্ত্ব বলিয়াছেন, যোগবাশিষ্ঠ সেইটিকেই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। বৌদ্ধরা বলেন ঐ বিজ্ঞানের মধ্যে মনের স্ফুরণ হয় এবং তাহাই

জগৎরূপ মায়ার সৃষ্টি করে, ঐ মনও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা, একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য বস্তু। যোগবাশিষ্ঠ ঠিক এই মতটিই গ্রহণ করিয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের দার্শনিক মতটির পরিচয় দিতে এখানে কিছু বিস্তৃতভাবেই ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—কারণ ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় এবং অধ্যাত্ম সাধনায় যোগবাশিষ্ঠ এককালে খুবই উচ্চস্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! এই যে সম্মুখে আকাশ ভূতাদি ও ও অন্তরে অহংরূপ প্রভৃতি দৃশ্যমান হইতেছে, সেই সমুদয় ব্যবহারদশায় জগৎ, কিন্তু পরমার্থ দশায় অজর অমর ও অব্যয় ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জগৎ শব্দের নামান্তর নাই। বস্তুতঃ দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন নাই, ইহা শূন্যও নয়, জড়ও নয়, কেবল শান্তিময়। রামচন্দ্র কহিলেন—হে প্রভো! যদি এই জরামরণাদি-দুঃখসঙ্কুল পর্বতাকাশাদিময় সংসারে কিছুই নাই, তবে এ সমুদয় কি দেখিতেছি? বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রামচন্দ্র! আমার বাক্য অসঙ্গত নহে, সত্যই এই বিশ্ব বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক। তথাপি যে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা কিছুই নহে, ইহা পূর্বে সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া ইহা নাই। ইহা কেবল স্বপ্নানুভূত গৃহাদির ন্যায় মনেরই ভাব মাত্র। ঐ মনও বাস্তবিকই অনুৎপন্ন ও অশরীরী। স্বপ্ন যেমন স্বপ্নান্তরকে দর্শন করায়, সেই মত মন স্বয়ং অসৎ হইলেও স্বকীয় ইচ্ছার অগ্রে স্বদেহ কল্পনা করিয়া তাহারই দ্বারা ইন্দ্রজাল শোভার ন্যায় এই জগৎ-শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। একমাত্র চলৎ শক্তিমান মনই স্ফুরিত হইতেছে, ভ্রমণ করিতেছে, নিমগ্ন হইতেছে, সংহার করিতেছে। সকলই মনের কার্য্য, মন ব্যতীত বিশ্ব নাই (৩।৪)। রাম কহিলেন,—হে মুনিবর! এই মনও যে মিথ্যা, ইহার কারণ কি এবং এই মায়াময় মন কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! যিনি সাংখ্যমতের পুরুষ ও বেদান্তীদিগের ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদীদের সুনির্মল বিজ্ঞান, শূন্যবাদীদের শূন্য, সূর্য্যাদি তেজস্বীদেরও প্রকাশক যিনি বক্তা, অনুমন্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা ও কর্তৃরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, এবং যিনি সৎ হইয়াও অসৎ ও দেহমধ্যবর্তী হইয়াও দূরস্থিত। এক সূর্য্য হইতে কিরণজালের ন্যায় যাহা হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ প্রকাশ পাইয়াছেন; সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় যাহাতে এই নিখিল বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে। যিনি বায়ুরূপী হইয়া ইন্দ্রিয়দলশালিনী, ব্রহ্মাণ্ডরূপফলশালিনী চিন্মূলা প্রকৃতিরূপা লতাকে নর্ত্তিতা করিয়া থাকেন। যাঁহার প্রশান্ত চিদ্‌ঘন অর্থাৎ চিদাকাশরূপ মেঘে সৃষ্টিরূপ বিদ্যুতের প্রকাশ ও প্রাণরূপ জল বর্ষণ হইয়া থাকে; যাঁহার

প্রভায় সমস্ত বস্তুর প্রকাশ হয়, যিনি অসদ্বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা হইতেই সদ্বস্তু সত্তাবান হইয়াছে, যাঁহার সন্নিধানবশতই এই জড় শরীর চলচ্ছক্তিসম্পন্ন, সর্বসত্তাতিগামী যাহা হইতেই নিয়তি, দেশ, কাল ও চলনস্পন্দনাদি ক্রিয়া-সকল সুসম্পন্ন হইতেছে। শুদ্ধ চিন্ময় যিনি ব্যোমচিন্তায় আকাশরূপা, পদার্থচিন্তায় পদার্থ ভাব ধারণ করিতেছেন, যিনি এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াও কিছুই করেন নাই, এবং যিনি নির্বিকল্প স্বরূপ ও উদয়াস্তস্থিতি-গতি-বিহীন নির্বিকার অদ্বৈত আত্মায় অবস্থিত আছেন তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই (৩।৫)। হে রাম! এই দেবদেব পরমাত্মার সহিত একতাসিদ্ধি জ্ঞানযোগেই লাভ করা যায়, অন্য ক্লেশকর অনুষ্ঠানাদিতে তাহা হয় না। মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় এই সংসারভ্রমের একমাত্র শান্তিকানকরূপে তত্ত্বজ্ঞানই নিরূপিত আছে, জ্ঞান ভিন্ন কিছুই উপযোগী নহে। যেমন কতক ফলের (নির্মলী ফলের) সম্পর্কে জলের কলুষতা নষ্ট হয়, তদ্রূপ যোগাভ্যাসে বুদ্ধির মালিন্য দূর হয় এবং সৎ শাস্ত্রের অনুশীলনে ও সাধুসঙ্গে যে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় তাহাতে অবিদ্যা সংসার মায়া বিনষ্ট হয় (৩।৬)। বত্রিশ হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ বিরাট যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে নানা দৃষ্টান্ত ও আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া যাহা বলা হইয়াছে আমরা উপরে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিলাম। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, তত্ত্বের দিক দিয়া উহাতে অসঙ্গতি রহিয়াছে। একদিকে বলা হইতেছে জগৎ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক, অন্যদিকে বলা হইতেছে ব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন, ব্রহ্মই সব হইয়াছেন, সব কিছুকে চালাইতেছেন। তৎকালে ভারতে দার্শনিক চিন্তার যত ধারা উৎপন্ন হইয়াছিল, যোগবাশিষ্ঠে সে-সবেরই উল্লেখ আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে সমন্বয়ের কোন চেষ্টাই করা হয় নাই, যোগবাশিষ্ঠের মধ্যে সে-সব একাকার হইয়া আছে, তাই পদে পদে বিরোধ দৃষ্ট হয়। তবে বিশেষ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, যোগবাশিষ্ঠের নিজ দার্শনিক মতটি এইরূপ। ব্রহ্মচৈতন্যে অহং বা জগৎ নাই, চিত্তে বা মনেই এই দুইটির উদ্ভব হইয়াছে, মন যে স্বপ্ন দেখে তাহা যেমন অলীক, এই জগৎও তেমনিই অলীক। মনের আত্যন্তিক নাশ হইলেই দুঃখময় সংসার-সাগরের পারে উপস্থিত হইয়া শান্তিলাভ করা যায়। এইটি মূলতঃ বৌদ্ধমত এবং যোগবাশিষ্ঠ তাহা গ্রহণ করিয়াছে। তবে যোগবাশিষ্ঠ বেদান্তের ব্রহ্মকেও স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু নির্মল ব্রহ্মচৈতন্যে এই মিথ্যাসৃজনকারী মনের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল? এ-প্রশ্নের কোন সদুত্তর না পাইয়াই বৌদ্ধগণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। শঙ্কর আর এক উত্তর দিয়া

এই অসঙ্গতি দূর করিবার প্রয়াস করিয়াছেন—মায়া নামে এক অনির্বচনীয় শক্তি এই মনের এবং মনঃকল্পিত জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের মধ্যে এই মতের বীজ রহিয়াছে, কিন্তু তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। শঙ্কর যে সূক্ষ্ম যুক্তি তর্কের দ্বারা এই বিখ্যাত দার্শনিক মতবাদের প্রচার করিয়াছেন, যোগবাশিষ্ঠে তাহার একান্ত অভাব।* এই জন্যই কেহ কেহ যোগবাশিষ্ঠকে দার্শনিক গ্রন্থ না বলিয়া ধর্ম গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ যোগবাশিষ্ঠ মনুস্মৃতি প্রভৃতির ন্যায় ধর্মশাস্ত্র নহে, ইহা মোক্ষশাস্ত্র, অধ্যাত্মশাস্ত্র, এবং মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপই ইহাতে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে, তবে ইহার পদ্ধতি সাধারণ দর্শনশাস্ত্র হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় দর্শনশাস্ত্রে দার্শনিক ও অধ্যাত্ম তত্ত্বগুলি যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, হেতুমদ্ভি-র্বিনিশ্চিতৈঃ, এবং ইহাই প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের লক্ষণ। যোগবাশিষ্ঠ যুক্তিকে খুবই প্রাধান্য দিয়াছে। বশিষ্ঠ রামকে বলিলেন, "এক্ষণে যেরূপে তুমি সেই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে, সেইভাবে বহু যুক্তি দ্বারা বিস্তারপূর্বক বলিতেছি শ্রবণ কর" (৩।৭)। কিন্তু বস্তুতঃ বশিষ্ঠ যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন নাই; তিনি বহু উপমা ও গল্পের সাহায্যে অধ্যাত্ম তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহার মতে এইটিই তত্ত্বজ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায়—"হে রাম! এই জগৎ নামক মিথ্যাজ্ঞানরূপ রোগ বহুকাল হইতেই বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত ইহার কোন উপায়েই শান্তি হইবে না। হে সাধো! আমি তোমার জ্ঞানসিদ্ধির জন্য যে সকল আখ্যায়িকা বলিব, তাহা যদি শ্রবণ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে তুমি সুবোধ ও মুক্তস্বভাব। আর যদি উদ্বেগবশতঃ তাহার অর্দ্ধেক শুনিয়াই উঠিয়া যাও, তাহা হইলে তুমি শাস্ত্র শ্রবণের অযোগ্য পশুধর্মী হইবে ও তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না" (৩।৮।১-৬)। ব্রহ্ম হইতেছেন বাক্য ও মনের অগোচর, মানুষের সাধারণ মন বুদ্ধিকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা দিতে হইলে তর্কযুক্তি যেমন সহায়, উপমা ও গল্পও সেইরূপ সহায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান এইভাবে হয় না, তাহার জন্য প্রয়োজন স্বানুভব ও উপলব্ধি, আত্মার দ্বারাই আত্মাকে দর্শন করা যায়, যাহা কিছু আমাদের মধ্যে আত্মাকে উদ্বোধিত করিতে সাহায্য করে—তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক। বাক্যের এমন শক্তি

* অধ্যাপক বি, এল, আত্রেয় ঠিকই বলিয়াছেন, "In The Yogavasista the Advaita-Vada is not found in a conceptualised form, but in a cloud-like vague and unfinished form and without any fixed meaning in the terms used".

আছে যে, তাহা আমাদের মানসিক বুদ্ধির অতীত আত্মাকে স্পর্শ করে, উদ্বোধিত করে এবং যে-শাস্ত্রে এইরূপ মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন বাক্য আছে তাহাই প্রকৃত অধ্যাত্মশাস্ত্র। বেদ ও উপনিষদ এইরূপ অধ্যাত্মশাস্ত্র, তাহার পরেই এ-বিষয়ে গীতার স্থান। গীতা যুক্তি তর্ক বা গল্পের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান পরিস্ফুট করে নাই, কিন্তু সত্যকে সমগ্রভাবে দেখিয়া এমন শক্তিপূর্ণ বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে যে তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলেই সত্য বলিয়া অনুভূত হয়, আর সংশয়ের স্থান থাকে না। তাই অর্জুন বলিয়াছেন,

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।

গীতার মধ্যেই গীতাকে গুহ্যতম শাস্ত্র বলা হইয়াছে। তবে শুধু শাস্ত্র শ্রবণ করিলেই তত্ত্বজ্ঞান হয় না, শাস্ত্রশ্রবণে মনের মধ্যে যে উদ্বোধন আসে তাহা লইয়া আত্মার সহিত যোগ অভ্যাস করিলে তবে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ যোগকে এইরূপ উচ্চ স্থান দেয় নাই—তাহার মতে যোগবাশিষ্ঠখানি ভাল করিয়া পড়িলেই তত্ত্বজ্ঞান হইবে। "চিত্তনিরোধ করিলে চেত্য (দৃশ্য) দর্শন লুপ্ত হয় না। 'দৃশ্যবস্তুসকল মিথ্যা ভ্রান্তির পরিণাম' একমাত্র এ জ্ঞান ব্যতীত চিত্তের চেত্যোন্মুখতা নিরোধ করা যায় না, সুতরাং দৃশ্যদর্শনের শান্তি হওয়াও অসম্ভব। 'দৃশ্যমাত্রেই অসম্ভব অর্থাৎ মিথ্যা' এ-বোধ ব্যতীত দৃশ্যাতীত চিৎস্বরূপ মোক্ষেরও সম্ভাবনা নাই। যোগ দ্বারা দৃশ্য-দর্শনের নিরোধে ফল নাই, তাহাতে জগতের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় না (৩।৭।১১-১৪)।" যোগবাশিষ্ঠের এখানে বক্তব্য এই যে, রাজযোগের সাধনা দ্বারা চিত্তনিরোধ করিলে সাময়িকভাবে সংসারজ্ঞান লুপ্ত হয়, কিন্তু সমাধির অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিলেই আবার সেই সংসার ফিরিয়া আইসে। কিন্তু "জগৎ মিথ্যা" এই ধারণা যদি বদ্ধমূল হইয়া যায় তাহা হইলেই প্রকৃত স্থায়ী মুক্তিলাভ করা যায় এবং সৎশাস্ত্রের শ্রবণ ও মনন হইতেই এইরূপ জ্ঞান লাভ করা যায়—

ন তীর্থেন ন দানেন ন স্নানেন ন বিদ্যয়া।
ন ধ্যানেন ন যোগেন ন তপোভির্ণচাধ্বরৈঃ।। ৬(২)।১৭৪।২৪
অত্র জ্ঞানমনুষ্ঠানং ন ত্বন্যদুপযুজ্যতে। ৩।৬।২

ইহা খাঁটি জ্ঞানযোগ, তবে ব্রহ্মসূত্রাদিতে যে বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ প্রচারিত হইয়াছে তাহার সহিত যোগবাশিষ্ঠের প্রভেদ এই যে, এখানে "জগৎ" মিথ্যা এই জ্ঞানের উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতে আমরা যোগবাশিষ্ঠের উপর বৌদ্ধমতেরই বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাই এবং ইহারই অনুসরণ করিয়া শঙ্কর যে পন্থা প্রচার করিয়াছেন তাহাই বর্তমানে জ্ঞান-

যোগ বলিয়া পবিচিত। কিন্তু বস্তুতঃ উপনিষদে কোথাও "জগৎ মিথ্যা" এই তত্ত্ব প্রচাবিত হয নাই এবং খাঁটি বৈদান্তিক জ্ঞানযোগেব সাধনা হইতেছে, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যেব শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—সেখানে "জগৎ-মিথ্যা" এই চিন্তা কবিবাব কোন নির্দ্দেশ নাই, জীবাত্মা ব্রহ্মেব সহিত মূলতঃ এক এই অদ্বৈত মতেব ধাবণা ও অভ্যাসই প্রকৃত বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ। এই জ্ঞানযোগে চাবিটি মহাবাক্যই প্রধানতঃ অবলম্বনীয়—(১) ঐতবেয আবণ্যকেব ষষ্ঠাধ্যাযে ঋগ্বেদীয 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (২) বৃহদাবণ্যকেব প্রথমাধ্যাযে যজুর্বেদীয "অহং ব্রহ্মাস্মি " (৩) ছান্দোগ্যেব ষষ্ঠাদি অধ্যাযে সামবেদীয "তত্ত্বমসি", এবং (৪) মাণ্ডুক্যেব দ্বিতীয মন্ত্রে অথর্ববেদীয— "অযমাত্মা ব্রহ্ম"। লক্ষ্য কবিতে হইবে যে, এই সব বাক্যে কোথাও বলা হয নাই যে, এই জগৎ মিথ্যা ভ্রম। মহাভাবত ও গীতায এই বেদমূলক জ্ঞানযোগই প্রচাবিত হইযাছে। সনৎসুজাতীয গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যাব উপসংহাব কবিবাব নিমিত্ত বলা হইযাছে—

তদেতদস্য সংস্থিতং ভাতি সর্বং
তদাত্মবিৎ পশ্যতি জ্ঞানযোগাৎ।
তস্মিন্ জগৎ সর্বমিদং প্রতিষ্ঠিতম্।
য এতদ্ বিদুবমৃতা স্তে ভবন্তি। ৩।২৪

"যে সকল বস্তু প্রকাশ্যরূপে অবস্থিত তাহা ব্রহ্মেব বিকাশমাত্র, কাবণ তাহাতেই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত আছে। আত্মবিৎ জ্ঞানযোগে এই বহস্য দর্শন কবিযা থাকেন। যে-ব্যক্তি বিশ্বেব এইরূপ বহস্য বুঝিতে পাবেন, তিনি মবণধর্ম বহিত হইযা বিবাজ কবেন।"

তত্ত্বমসি আদি মহাবাক্যেব শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন পূর্বক এইরূপ আত্মতত্ত্বেব অবধাবণই জ্ঞানযোগ, যোগশাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে চিত্তকে সংযত ও শুদ্ধ কবিলে ইহাতে সহাযতা হয, তাই গীতাদি বৈদান্তিক শাস্ত্রেও বাজযোগেব উপদেশ দেওযা হইযাছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এইরূপ বাজযোগেব সাধনাব নিমিত্ত সংসাব ত্যাগ কবিযা সন্ন্যাসী হওযা অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন কবা অবশ্য-প্রযোজনীয কি না। আমবা পূর্বেই দেখিযাছি ব্রহ্মসূত্রে বা গীতায কোথাও সন্ন্যাস অপবিহার্য্য বলিযা স্বীকৃত হয নাই। গৃহস্থাশ্রমে থাকিযাও যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ কবা যায তাহা উপনিষদেও স্বীকৃত হইযাছে। বৃহদাবণ্যক উপনিষদে সন্ন্যাস সম্বন্ধে বলা হইযাছে—"এই আত্মাকে জানিয়া ব্রাহ্মণ যখন পুত্রাদি বাসনা হইতে ব্যুত্থিত হন তখন তিনি ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন" (৩।৫।১)। অতএব উপনিষদেব মতে সন্ন্যাস

অবলম্বনের পূর্বেই আত্মা বা ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম হওয়া যায়। তাহার পর যাহার ইচ্ছা হয় তিনি সংসারত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারেন। গীতা জ্ঞানলাভের পরও গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া সকল কর্ম করার উপরই জোর দিয়াছে—এবং ইহারও সমর্থন উপনিষদেই আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যোগসাধনার জন্য এবং জ্ঞানলাভের জন্যই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া প্রয়োজন, আর জ্ঞান লাভের পর সংসারের ত কোন কথাই নাই। সংসার মায়া মিথ্যা—এই ধারণা হইতেই শঙ্কর সন্ন্যাসকে এমন দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে, যে-যোগবাশিষ্ঠ হইতে শঙ্কর তাঁহার সংসার-মিথ্যাবোধের এবং মায়াবাদের সমর্থন পাইয়াছেন সেখানে সন্ন্যাস ও সংসারত্যাগকে অতি তীব্রভাবে নিন্দা করা হইয়াছে। আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যোগবাশিষ্ঠের মতে ঐ গ্রন্থখানি শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করিলেই তত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তি লাভ হয়। ইহা প্রশংসাসূচক অত্যুক্তিমাত্র—বস্তুতঃ যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে সাধনার নানা পন্থা দেখান হইয়াছে এবং সুবিধা মত সব পন্থারই সাহায্য লইতে বলা হইয়াছে। ইহা ভারতের বৈশিষ্ট্য, এখানে কোন পন্থাই অবহেলিত হয় নাই—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি সবই হইতেছে অধ্যাত্ম জীবনলাভের পন্থা। কোন বিশেষ সম্প্রদায় কোন বিশেষ পন্থাকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করিলেও অন্যগুলিকেও গৌণ সহায়রূপে গ্রহণ করে। তবে গীতার মধ্যে এই সব পন্থার যেমন নিগূঢ় সমন্বয় করা হইয়াছে এমনটি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তত্ত্বের দিক দিয়া যোগবাশিষ্ঠ তৎকাল-প্রচলিত সকল দার্শনিক মতই উল্লেখ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে ভেদ ও বিরোধ আছে সে-সবের মীমাংসা করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া মোটামুটি ভাবে বলিয়া দিয়াছে যে মূলতঃ ঐ সব মতই এক। বশিষ্ঠ কহিলেন, "হে রাম! শূন্যবাদীরা যাঁহাকে শূন্য কহে; ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; বিজ্ঞানবিদেরা যাঁহাকে বিজ্ঞানস্বরূপ অমলপদ বলিয়া থাকেন। যিনি সাঙ্খ্যদর্শনের মতে পুরুষ, যোগীদের নিকট ঈশ্বর, শৈবেরা যাহাকে শিব বলেন, কালবাদীরা যাঁহাকে কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং আত্মজ্ঞানীর নিকট যিনি আত্মা ও যে মধ্যমবাদীরা চিদচিদের মধ্যম শূন্যমাত্র জানিতেছে তাঁহাদের নিকট ক্ষণিক জ্ঞানপ্রবাহরূপে যিনি জ্ঞাত হন, জীবন্মুক্তেরা যাঁহাকে পূর্ণ বলিয়া অবগত হন এবং যাহা সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তস্বরূপ ও সর্বব্যাপী বলিয়া যাহা সকলের হৃদয়বর্ত্তী ও সর্বস্বরূপ, বীতহব্য মুনি তাদৃশ স্বারূপ্যই লাভ করিলেন এবং যাহা সাতিশয় নিষ্ক্রিয়ভাবে

যাবৎ তেজের উপর দেদীপ্যমান থাকে, মুনিবর সেই এক স্বানুভব মাত্র প্রসিদ্ধ সৎস্বরূপে অবস্থান করিলেন। যাহা এক হইয়াও অনেক ও অন্ধকার হইয়াও প্রকাশমান ও যাহা সমুদয় বস্তুর অতীত হইয়াও সর্বস্বরূপে আছে, তৎস্বরূপেই মুনিবর অবস্থান করিলেন। সেই বীতহব্য মুনি আকাশ হইতেও নির্মলস্বরূপ হইয়া অনাদি, অজ, জরাবিহীন, এক ও অনেক, অপূর্ণ হইয়াও পরিপূর্ণ তুরীয় পদলাভ করতঃ মুহূর্ত মধ্যে ঈশ্বররূপ হইলেন। (৫।৮৭।১৫।২৪)

ভারতবাসীর একটা সহজবোধ আছে যে, সকল শাস্ত্র আপন আপন ভাবে এক ভগবানেরই পরিচয় দিতেছে। ইহা বেদেরই বাণী, একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি ঋগ্বেদ (১০।৩০।১)। কিন্তু দার্শনিক বুদ্ধিকে তৃপ্ত করিতে হইলে দেখাইয়া দিতে হয় কেমন করিয়া একেরই এই বহু ভাব হইয়াছে। বেদান্ত ব্রহ্মের যে বর্ণনা দিয়াছে, সাংখ্যের পুরুষ, পাতঞ্জলের ঈশ্বর, বৌদ্ধগণের শূন্য বা বিজ্ঞান, শৈবগণের শিব—তত্ত্বের দিক দিয়া এগুলি বিভিন্ন, তবে কেমন করিয়া তাহারা একই সদ্‌বস্তুর জ্ঞাপক হয়? বস্তুতঃ এই সব দার্শনিক মত পরস্পরের মতকে যুক্তিতর্কের দ্বারা খণ্ডনই করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সমন্বয় করিতে হইলে দেখাইয়া দিতে হইবে যে, পরম সদ্‌বস্তু এই সব তত্ত্বের কোনটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু ইহারা কেবল তাহার এক একটি দিক বা ভাবকেই প্রকাশ করিতেছে। সদ্‌বস্তুকে এমন পূর্ণরূপে দেখিতে হইবে যাহাতে তাহার মধ্যে এইসব তত্ত্বেরই সমন্বয় হয়। গীতা পুরুষোত্তমের পরিকল্পনায় এইরূপই এক সমন্বয় করিয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের মধ্যে সেরূপ কোন সমন্বয়ের প্রয়াস নাই। যোগবাশিষ্ঠ উপমাদির সাহায্যে পাঠকের মনে এই সকল বিভিন্ন তত্ত্বের একটা ধারণা জন্মাইয়া দিয়া সমন্বয়ের উপলব্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। কিন্তু জাগ্রত দার্শনিক বুদ্ধি এইরূপ একাকারে পরিতৃপ্ত হয় না, তাহা একটা স্ববিরোধশূন্য যুক্তিসঙ্গত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চায় এবং শঙ্কর তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মের সগুণ, সক্রিয় দিকটা মিথ্যা মায়া বলিয়া যুক্তির দিক দিয়া একটা সঙ্গতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং যোগবাশিষ্ঠ বৌদ্ধমত অনুসারে "জগৎ অলীক" এই তত্ত্বের উপরেই বিশেষ জোর দিয়া শঙ্করের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ সন্ন্যাস সমর্থন করে নাই, এবং যোগসাধনার জন্য শঙ্করের ন্যায় বনে বা গুহায় যাইবার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে নাই। বশিষ্ঠ বলিলেন, "কর্মফলের দিকে বুদ্ধি রাখিও না; কর্মত্যাগ করা-তেও কোন আকাঙক্ষা রাখিও না; ফলাকাঙক্ষা না রাখিয়া কর্ম

করা বা না করা উভয়েই সমান (৬(২)।১।২৬)। "যাহারা বিপরীত বুঝিয়া অত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া ধারণা করে, সেই সকল অজ্ঞ পশুদিগকে কর্মত্যাগরূপ পিশাচী আসিয়া ভক্ষণ করে। যাহারা সমূলে কর্মচ্ছেদ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছে, তাহাদের কর্মের অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠান কিছুতেই প্রয়োজন নাই।···তত্ত্বজ্ঞানে কর্মত্যাগ হইলে, সেই বাসনারহিত জীবন্মুক্ত পুরুষ গৃহে বা অরণ্যেই বাস করুন, অথবা দরিদ্রতাই প্রাপ্ত হউন বা ধনী হউন, তিনি যে 'শম' তাহা অবধারিত। শমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে গৃহই নির্জন সুদূর কাননের স্থলাভিষিক্ত, আর যাঁহার শমপ্রাপ্তি হয় নাই, নির্জন গভীর অরণ্যও তাঁহার পক্ষে জনতাপূর্ণ নগরীর তুল্য" (৬(২)।৩)। নির্বাণ প্রকরণে রাণী চূড়ালার কাহিনীতে যোগবাশিষ্ঠ সুন্দরভাবে প্রকট করিয়াছে যে, জ্ঞান বা মুক্তিলাভের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার বা বনে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। ভোগসুখ ত্যাগ নহে, তাহাদের প্রতি লালসা ত্যাগ, বাসনা ত্যাগই জ্ঞানলাভের প্রকৃত পন্থা। যিনি জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন তাঁহারও উচিত সংসারে থাকিয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম করা, যদিও এ-বিষয়ে তাঁহার বাধ্যবাধকতা কিছুই নাই। যোগবাশিষ্ঠের জীবন্মুক্ত পুরুষেরা সকলেই বিরাট কর্মী, রাজ্য শাসন করিয়াছেন এবং সকলকে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন। মুক্তিলাভের জন্য কর্মত্যাগ বা কঠোর তপস্যা—এসবের কোন প্রয়োজন নাই। দৈত্য-রাজ বলি তাঁহার গুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট গিয়া বলিলেন—"আমি মহা-মোহপ্রদ ভোগসমূহের প্রতি বিরক্ত হইয়াছি। অতএব যাহাতে আমার ঐ ভোগজনিত মহামোহ দূরীভূত হয়, সেই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি।" শুক্র কহিলেন, "হে অখিল দানবেন্দ্র! আমি এক্ষণে আকাশমার্গে যাইতেছি, অধিক আর কি বলিব, সংক্ষেপে সার কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই জগতে একমাত্র চিৎই বিদ্যমান, এই জগৎ চিৎ ও চিন্ময়। তুমিও চিৎ, আমিও চিৎ, এই সমস্ত লোকও চিৎ ইহাই সার জানিবে। চিৎকে চেত্য-রূপে (অর্থাৎ দৃশ্য বাহ্য জগৎরূপে) কল্পনা করার নাম বন্ধ এবং উক্ত কল্পনা মোচনের নাম মুক্তি। কল্পিত চেত্য (দৃশ্য) আকার হইতে নির্মুক্ত চিৎই পূর্ণ আত্মা, ইহাই সমুদয় সার সিদ্ধান্ত। এইরূপ নিশ্চয় গ্রহণ করিয়া নিজে অনায়াসেই আত্মাকে আপন আত্মায় দেখিতে পাইবে এবং অনন্ত পদ প্রাপ্ত হইবে। আমি এক্ষণে আকাশে যাইতেছি, ঐ স্থানে সপ্তর্ষিগণ সমাগত হইয়াছেন, কোন দেবকার্য্যের অনুরোধে আমাকে সেই স্থানে যাইতে হইবে। রাজন্! যতদিন এই দেহ থাকে, ততদিন মুক্তধী

ব্যক্তিগণ যথাপ্রাপ্ত কার্য্য ত্যাগ করিতে পারেন না। এ কারণ সর্বত্যাগী অনাসক্তবুদ্ধি হইলেও আমি উপস্থিত সুরকার্য্য ত্যাগ করিতে পারিতেছি না"। ৫।২৬

বশিষ্ঠ এখানে যে সার সিদ্ধান্ত বলিলেন, তাহা বস্তুতঃ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের মত—যোগবাশিষ্ঠ এইটিকেই ব্রহ্মবাদীদের মত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বেদান্তদর্শন ব্রহ্মসূত্রে ঐ বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়াছে—বেদান্তমতে জগৎ ঐরূপ চিত্তের কল্পনামাত্র নহে, উহার বস্তুগত সত্তা আছে এবং উহা পরম সদ্‌বস্তু ব্রহ্ম হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে—জন্মাদ্যস্য যতঃ। যোগবাশিষ্ঠ এই দুই মতের পার্থক্য কোথায়, সমন্বয় কি তাহা দেখাইবার কোন চেষ্টা করে নাই।

মুক্ত ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া কর্ম করিবে, এই মতটিও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের। পূর্বে বৌদ্ধেরা জগৎ মিথ্যা বলিয়া সংসার ত্যাগ ও কর্ম ত্যাগের আদর্শই প্রচার করিয়াছিল। পরে গীতার শিক্ষার প্রভাবে বৌদ্ধদের সেই সন্ন্যাস ধর্ম সেবাধর্মে পরিণত হয়। কিন্তু জগৎ যদি মিথ্যা হয়, এবং এই মিথ্যাজ্ঞানই যত দুঃখের মূল হয়, তাহা হইলে আর সংসারে থাকিয়া কর্ম করিবার সার্থকতা কি? মুক্ত পুরুষ যদি দেহত্যাগ পর্য্যন্ত কর্ম করিতে বাধ্য হন, তবে লোককে প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন কর্মই তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না। এ-বিষয়ে শঙ্করের শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত।

ভারতের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতা বিকাশের ইতিহাসে যোগবাশিষ্ঠের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতবাসী সন্ন্যাস ও কর্মত্যাগের দিকে ঝুঁকিতেছিল, সেই সময়ে গীতা মহান কর্মযোগের আদর্শ প্রচার করিয়া সেই প্রবৃত্তিকে বাধা দেয়। গীতারই প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম শান্ত নিষ্ক্রিয় সন্ন্যাসীর ধর্মের পরিবর্তে মৈত্রী, করুণা ও সেবার ধর্মে পরিণত হয়, তাহাই মহাযান বৌদ্ধধর্ম। ভারতের এই যুগটিই হইতেছে মহান কর্ম ও ভোগের যুগ, এবং এই যুগের প্রতিনিধিস্বরূপ কবি হইতেছেন কালিদাস, তাই আমরা এই যুগটিকে কালিদাসের যুগ নামেই অভিহিত করিয়াছি, যদিও ইহা কালিদাসের পূর্বে ও পরে কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগেরই শেষের দিকে একটা প্রতিক্রিয়া আসে, ভারতবাসীর জীবনীশক্তি কালক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, "জগৎ মিথ্যা," বৌদ্ধগণের এই দার্শনিক মত আবার মাথা তুলিয়া উঠে, লোকে আবার সন্ন্যাস ও কর্মত্যাগের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করে। এই

সন্ধিক্ষণেই যোগবাশিষ্ঠ রচিত হইয়াছিল। পণ্ডিতরা নির্ণয় করিয়াছেন যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব রবি অস্তমিত হইতেছিল তখনই যোগবাশিষ্ঠ রচিত হয়। তাঁহাদের মতে কালিদাসের আবির্ভাব হয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং শঙ্করের আবির্ভাব হয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে। শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের বিখ্যাত কারিকা রচনায় যোগবাশিষ্ঠেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধ কর্তৃক অহিংসা ও সন্ন্যাসধর্ম প্রচারে ভারতে ক্ষাত্রশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং বুদ্ধের মৃত্যুর অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই ভারত বিদেশীর আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে পারসিকগণ এবং পরে আলেক-জান্দারের গ্রীক বাহিণী ভারতে রাজ্য স্থাপন করে। এই বিপদ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্যই গীতায় ক্ষাত্রধর্মের আদর্শ পুনরায় নূতন ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। পরে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারত জাতীয় গৌরবের উচ্চসীমায় উঠে। আবার বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হয়, হুণ-গণের আক্রমণে ভারত বিপর্য্যস্ত হয়—সম্ভবতঃ সেই সময়ে গীতার অনু-সরণে যোগবাশিষ্ঠ রচিত হইয়াছিল। গীতা যেমন ক্ষত্রিগবীর অর্জুনের বিষাদকে উপলক্ষ্য করিয়া মহান কর্মযোগের আদর্শ প্রচার করিয়াছিল, যোগ-বাশিষ্ঠ তেমনই রামচন্দ্রের বৈরাগ্য কল্পনা করিয়া বশিষ্ঠ কর্তৃক তাহাকে রাজধর্ম ও সংসারধর্মে প্রবৃত্ত করিবার উপদেশ ছলে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু গীতা হইতে যোগবাশিষ্ঠের সময়ের অনেক ব্যবধান এবং ইতিমধ্যে ভারত-বাসীর মতিগতি ও চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল। গীতার যুগে ভারতবাসী দার্শনিকতার দিকে ততদূর ঝোঁকে নাই, তখনও তাহা-দের প্রাণশক্তি এবং সেই সঙ্গে কর্মশক্তি খুবই প্রবল ছিল—কেবল বৌদ্ধ-গণের সন্ন্যাসের শিক্ষা তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিভেদের সৃষ্টি করিতেছিল—গীতায় অর্জুনের বিষাদে এইরূপ বুদ্ধিভেদই পরিস্ফুট করা হইয়াছিল। অর্জুন দার্শনিক চিন্তাশীল ব্যক্তি নহেন, তিনি কর্মী। অন্যপক্ষে যোগ-বাশিষ্ঠের রামচন্দ্র তর্ক করিতে বিশেষ পটু; দার্শনিক চিন্তা দ্বারা সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া তিনি তাঁহার ক্ষাত্রধর্মে, রাজধর্মে উদাসীন হইয়াছেন—তাঁহাকে রাজধর্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ। বৌদ্ধগণ যে দার্শনিকতার প্রবর্তন করেন তাহার ফলেই ভারতবাসীর মন দার্শনিকভাবাপন্ন ও সংসারবিমুখ, কর্মবিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। যোগ-বাশিষ্ঠের প্রয়াস খুব সফল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। আমরা দেখিতে পাই সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবার পর রাজকোষ শূন্য

করিয়া দান করিতেছেন, রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেছেন। যোগবাশিষ্ঠের অসফলতার কারণ উহা দার্শনিক যুক্তি তর্কের দ্বারা বৌদ্ধ দার্শনিক মত খণ্ডন করিতে পারে নাই, পরন্তু প্রকারান্তরে বৌদ্ধমতকেই মানিয়া লইয়াছে —কেবল বলিয়াছে যে, সংসার অনিত্য ও মিথ্যা হইলেও, যখন দেহধারী মানবের পক্ষে কর্মত্যাগ করা সম্ভব নহে, তখন যতদিন এই দেহটা থাকে সংসারের প্রয়োজনীয় সকল কর্মই করা কর্তব্য। ইহা গীতার শিক্ষারই অনুরূপ বলিয়া মনে হয়।* কিন্তু গীতা দার্শনিক মতবাদের উপর মহান কর্মযোগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যোগবাশিষ্ঠে তাহার অভাব। সংসার যদি মিথ্যা হয় তবে যতদিন দেহ থাকিবে, জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যন্ত্রবৎ দেহ-ক্রিয়া চলিতে পারে, তিনি উৎসাহের সহিত সাংসারিক কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? রাজ্যশাসন ও যুদ্ধের ন্যায় বিশাল ও ঘোর কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন কিসের জন্য? আর যদি পূর্ব সংস্কারের বশে বাধ্য হইয়াই তাহাকে সেই কর্ম করিতে হয় তাহা হইলে আর দর্শন শাস্ত্র রচনা করিয়া সে-বিষয়ে উপদেশ দিবারই বা সার্থকতা কি? বস্তুতঃ এইরূপে অবশভাবে প্রকৃতির বশে কর্ম করা গীতার কর্মযোগ নহে। সংসার নাই, কর্ম নাই—এ-সবই মিথ্যা মায়া এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে তাহার কর্ম কর্মই নয়, অতএব তাহার কোন কর্ম-ত্যাগেরই আবশ্যক নাই—ইহাই যোগবাশিষ্ঠের যুক্তি। বশিষ্ঠ কহিলেন, "জলে যেমন দ্রবত্ব ও তেজে যেমন আলোক বিদ্যমান থাকে সেইরূপ পরব্রহ্মেও চিদ্‌ভাব ও চিত্তভাব দুইই বর্তমান আছে। দৃশ্য প্রকাশ করাই চিত্তের কর্ম; সেই কূটস্থ চৈতন্য হইতে ঐ দৃশ্য ভ্রমপ্রতীয়মান যক্ষের ন্যায় বৃথাই উদিত হইয়া থাকে। বস্তুগত্যা তাহা উদিত নহে, অতএব কর্ম নাই ইহা স্থির।·· হে রাম! কথিত প্রকার বেদনত্যাগেই কর্ম ত্যাগ সিদ্ধ হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে নহে; যাহারা এইরূপ কর্মত্যাগ না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতে যায়, তাহারা আকাশ মারণ (অর্থাৎ শূন্যে আঘাত করা) কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে কর্মত্যাগ আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়। ইচ্ছাশূন্য জীবন্মুক্তেরা মহারম্ভে কোন কর্ম করিলেও তাহা অক্রিয়াস্বরূপ; কেননা তাহাতে কর্মবীজ বাসনা নাই।" (৬(২)।৩)

কিন্তু বাসনাই যদি সকল কর্মের বীজ হয়, এবং জীবন্মুক্তেরা তাহা জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট করিয়া দেন তাহা হইলে তাহারা মহারম্ভে মহা উৎসাহে

* বস্তুতঃ লোকমান্য তিলক প্রভৃতি গীতার আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ যোগবাশিষ্ঠের অনুসরণ করিয়াই গীতার কর্মযোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কোনও কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন কি প্রকারে? বস্তুতঃ যোগবাশিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীর কর্মের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছে তাহা প্রকৃতির অধীন যন্ত্রবৎ কর্ম—"কর্মবীজ পরিত্যক্ত হইলে জীবের ব্রহ্মভাবাতিরিক্ত চিদাভাসাত্মক দৃশ্যপ্রপঞ্চ লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়; তখন আর তত্ত্ববিদের গ্রহণীয় বা ত্যজ্য কিছুই থাকে না। তখন তত্ত্ববিৎ শান্তভাবে অবস্থান করেন; ত্যাগ বা গ্রহণ কাহাকে বলে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন না; আকাশের ন্যায় শূন্যহৃদয় হইয়া যথাস্থিত ভাবে অবস্থান করেন। কেবল যথাপ্রাপ্ত কর্মের আচরণ করেন; তাহাও এত অনবহিত হইয়া করেন যে পরক্ষণেই করেন নাই বলিয়া বোধ করেন। যেমন নদীপ্রবাহে নিপতিত তৃণকাষ্ঠাদি নিজের চেষ্টা ব্যতিরেকেই স্পন্দিত হয়, সেইরূপ তাঁহাদের কর্মেন্দ্রিয়সকল মনোবিকার ব্যতিরেকেই স্পন্দিত হয়। অর্থাৎ বাহ্যকর্মকরণসমুদয়ে তাঁহাদের মনোগতি স্থির থাকে, মন কিছুই জানিতে পারে না যে, তিনি কি করিলেন।" (৬(২)।৩)

নদীপ্রবাহে যেমন তৃণ স্পন্দিত হয় সেইভাবে অন্ধ অজ্ঞান মিথ্যাময়ী প্রকৃতির বশে চালিত হওয়া গীতার আদর্শ নহে। বস্তুতঃ যোগবাশিষ্ঠ মুক্তপুরুষের যে-কর্মের কথা বলিয়াছে তাহা সন্ন্যাস আশ্রমেরই উপযোগী, গার্হস্থ্য আশ্রমের নহে, এবং পরে শঙ্করাচার্য্য ঠিক এই আদর্শটিরই প্রচার করিয়াছিলেন। জ্ঞানী মুক্ত পুরুষ কেন সংসারে থাকিয়া কর্ম করিবেন, তাঁহার ভিতরের শান্তভাবের সম্পূর্ণ অনুকূল সন্ন্যাস আশ্রম কেন অবলম্বন করিবেন না তাহার সপক্ষে কোন প্রবল যুক্তি যোগবাশিষ্ঠ দিতে পারে নাই, কেবল কতকগুলি গল্প রচনা করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছে যে, জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও সংসারে থাকিয়া কর্ম করেন, ভোগ করেন, রাজ্য পরিচালনা করেন। কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষের যে বর্ণনা যোগবাশিষ্ঠ দিয়াছে, তাঁহার জ্ঞানকে যে দার্শনিক রূপ দিয়াছে তাহার সহিত এ-সব কর্ম খাপ খায় না, সন্ন্যাসই তাহার অবলম্বনীয়। বস্তুতঃ পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য যোগবাশিষ্ঠের বর্ণনানুযায়ী জীবন্মুক্তের আদর্শ গ্রহণ করিয়াই শঙ্করের সন্ন্যাসবাদের সমর্থন করিয়াছেন।

গীতার জীবন্মুক্ত পুরুষ ইহা হইতে বিভিন্ন। গীতাও বলিয়াছে বটে, মুক্ত পুরুষ কেবল ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা শারীর কর্ম করেন—তাঁহার মন বুদ্ধি সে কর্ম উদ্ভাবন করে না, নিয়ন্ত্রণ করে না (৪।২১)। কিন্তু তাঁহার কর্মের উৎস অন্ধ অচেতন প্রকৃতি বা মায়া নহে, তাঁহার কর্ম আসে ঊর্দ্ধ্ব হইতে, পুরুষোত্তম ও পরা প্রকৃতি হইতে। পুরুষোত্তম শুধুই নিশ্চল নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম নহেন, তিনিই আবার সক্রিয় সগুণ ব্রহ্ম, তাঁহারই শক্তি এই বিশ্বরূপে তাঁহাকেই প্রকট করিয়াছে—অতএব এই জগৎ মিথ্যা মায়া নহে,

কর্মও মিথ্যা নহে—সবই সেই ব্রহ্মের, পুরুষোত্তমের অভিব্যক্তি। গীতার শিক্ষার এই দিকটা ধরিয়াছিল তন্ত্র। তন্ত্র যে সংসারকে দিব্যভাবে ভোগ করিবার আদর্শ প্রচার করিয়াছিল তাহার দার্শনিক ভিত্তিটি সুদৃঢ় ছিল। কিন্তু তন্ত্র বেদান্ত হইতে বিভিন্ন এক ধারার বিকাশ করায় কোন দিনই ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। শঙ্কর তীক্ষ্ণ প্রতিভা লইয়া যে মায়াবাদের প্রচার করেন তাহাই সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া ভারতের চিন্তা ও সাধনার ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। শঙ্কর যে মায়াবাদের প্রচার করিয়াছিলেন তাহা মূলতঃ বৌদ্ধ মত। যোগবাশিষ্ঠ মায়াকে ব্রহ্মের উপর চাপাইয়া দিয়া বলিয়াছিল বেদান্ত ও বৌদ্ধ মতে কোন প্রভেদ নাই। শঙ্কর আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন ঐটি বেদান্তেরই মত, বৌদ্ধ মত নহে, কারণ বৌদ্ধেরা ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু বস্তুতঃ শঙ্করের ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা তাহা বুদ্ধগণের শূন্য বা বিজ্ঞান হইতে আদৌ বিভিন্ন নহে, শঙ্কর বেদ ও উপনিষদের ভাষায় বৌদ্ধ মতই প্রচার করিয়াছিলেন। তন্ত্র এক শক্তিশালী দর্শন ও সাধনার বিকাশ করিলেও শঙ্করের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তন্ত্রের বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল বাংলা দেশে। এই বাংলাদেশেই আমাদের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত ও তন্ত্রের সমন্বয় করিয়া এক নূতন যুগের সূচনা করিয়া গিয়াছেন—এই সমন্বয়ের বীজ গীতার মধ্যেই ছিল।

নিরাশীরপরিগ্রহঃ। নিরাশী, যতচিত্তাত্মা, অপরিগ্রহ—এই গুলিকে গীতা চতুর্থ অধ্যায়ে মুক্ত পুরুষের লক্ষণ বলিয়াছে (৪।২১), এখানে বলিতেছে যে, যোগীকে সাধনা করিয়া ক্রমশঃ ঐগুলিতে সিদ্ধ হইতে হইবে। শঙ্করের মতে এই শ্লোকে "রহসি" ও "একাকী" এই দুইটি কথা দ্বারাই সন্ন্যাস সূচিত হইয়াছে। তাহার উপর আবার "অপরিগ্রহ" কথাটির দ্বারা অতি তীব্র বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস বুঝান হইয়াছে, সংন্যাসিত্বেঽপি ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ সন্ যুঞ্জীত। নীলকণ্ঠ ইহাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসীর যে কন্থা পুস্তকাদি বহু পরিগ্রহ থাকে সে-সবও ফেলিয়া দিতে হইবে। এ-সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠ একটি গল্প দিয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের গল্পের সকল পাত্র পাত্রীরাই দার্শনিক চিন্তা ও বুদ্ধি সম্পন্ন, সংসারের অসারতা বিষয়ে তর্ক করিতে পটু—শেষ পর্য্যন্ত তাহারা এই সমাধান পায় যে, সংসার অসার—এই জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারের মধ্যে মহাকর্মী মহাভোগী হইয়া থাকিতে হইবে, দেহান্তে নির্বাণমুক্তি লাভ হইবে। দেবগুরুনন্দন শ্রীমান কচ শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া পদ ও পদার্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া সংসার

হইতে উদ্ধারবাসনায় বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন! আপনি সকল ধর্ম অবগত আছেন, অতএব বলুন দেখি, এই যে সংসারপিঞ্জর, ইহা হইতে জীব কিরূপে আপনার জীবনসূত্র ছিন্ন করিয়া নির্গত হইতে পারে? বৃহস্পতি কহিলেন, বৎস! সর্বত্যাগ কবিতে পাবিলেই জীব এই অনর্থরূপ মকরের আস্পদ এই সংসার সাগর হইতে নিরুদ্বেগে উত্তীর্ণ হইতে পারে। তখন কচ সমস্ত ত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে কঠিন তপস্যায় ব্রতী হইলেন—কিন্তু আট বৎসরের মধ্যেও বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ঘটনাক্রমে আবার পিতাব সহিত দেখা হইলে তিনি পিতাকে নিজ ব্যর্থতার কথা জ্ঞাপন করিলেন। বৃহস্পতি তাঁহার কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া 'সব ত্যাগ কর' এই কথা পুনরায় বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন কচ শরীর হইতে বল্কলাদি ত্যাগ করিলেন এবং গায়ে জল পড়িতে না পায় সেজন্য গুহাব মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বিশ্রান্তি লাভ করিতে না পারায় পুনরায় পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—পিতা! আমি সব পরিত্যাগ করিয়াছি, এমন কি গায়ের কন্থা ও বংশযষ্ঠি পর্য্যন্তও ত্যাগ করিয়াছি, তথাপি আমি স্বপদে বিশ্রান্তি লাভ করিতে পাবিতেছি না, আমি এক্ষণে কি করি বলুন। বৃহস্পতি কহিলেন,—বৎস! আমি যে তোমাকে সর্বত্যাগ করিতে বলিয়াছি, সে সর্ব শব্দের অর্থ চিত্ত, তুমি সেই সর্বাবয়ব চিত্তকে যদি ত্যাগ করিতে পার তাহা হইলে প্রকৃত ত্যাগী হইয়া সুস্থ হইতে পারিবে, সর্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা চিত্তত্যাগকে সর্বত্যাগ বলিয়া জানেন।' কচ জিজ্ঞাসা করিলেন চিত্তের স্বরূপ কি, চিত্ত কাহাকে বলে আমার নিকট বলুন, তাহার পরে আমি তাহা ত্যাগ করিব। বৃহস্পতি কহিলেন, চিত্তবিৎ পণ্ডিতেরা নিজ অহংকারকেই চিত্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। জীবের অন্তরে যে 'অহংভাব', আমি (এই পরিচ্ছিন্ন দেহই আমি) ইত্যাকার জ্ঞান বা অভিমান, তাহাকেই চিত্ত বলা হয়। কচ কহিলেন, পিতঃ! এই অহঙ্কারই চিত্ত, ইহা কিরূপ তাহা বুঝাইয়া বলুন (এই অহঙ্কার ত আত্মা, ইহা ত্যাগ করিলে আত্মত্যাগ করা হয়, সেই আত্মাই ত আমি, আমি আমাকে কিরূপে ত্যাগ করিব?) এই চিত্তের ত্যাগ বড়ই কঠিন বলিয়া বিবেচনা করি। বোধ হয় ইহা কেহই করিতে পারে না। বৃহস্পতি কহিলেন,—এই অহঙ্কারের ত্যাগ অতি সহজ, এমন কি একটি সামান্য কুসুম ছিন্ন করিয়া ফেলা অপেক্ষাও সহজ, চক্ষু মুদ্রিত করা অপেক্ষাও সহজ। এই অহঙ্কার ত্যাগে কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। হে তনয়! যেরূপে এই চিত্ত ত্যাগ করা যায় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। একমাত্র অজ্ঞান হইতে যে বস্তু

উৎপন্ন, তাহা উক্ত অজ্ঞানের অভাবে অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হইলে আপনিই নষ্ট হইয়া যায়! হে পুত্র! এই যে অহঙ্কারের কথা বলিলাম, উহা বাস্তবিক নাই, উহা মিথ্যা ভ্রান্তি অলীক। উহা একান্ত মিথ্যা হইলেও বালক-কল্পিত বেতালের ন্যায় সত্য হইয়া উঠিয়াছে। রজ্জুতে যেমন মিথ্যা সর্প-ভ্রান্তি জন্মে, মরুভূমিতে যেমন মিথ্যা জল-ভ্রান্তি হয়, সেইরূপ অহঙ্কার মিথ্যা ভ্রান্তির বিলাস। যেমন চক্ষুর দোষ ঘটিলে একমাত্র চন্দ্রকেও দুইটি বলিয়া জ্ঞান হয়, ফলতঃ তাহা যেমন ভ্রান্তি, সেইরূপ এই অহঙ্কারও ভ্রমক্রমে প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক অহঙ্কার সৎও নহে, অসৎও নহে। একমাত্র অনাদি অনন্ত চৈতন্য সত্য, আর সবই মিথ্যা; সে চৈতন্য অতি নির্মল, আকাশ অপেক্ষাও নির্মল এবং জ্ঞানস্বরূপে সর্বত্রই বিদ্যমান। যেমন বিলোল উর্মিমালা সর্বত্রই একমাত্র জল সেইরূপ একমাত্র চৈতন্যই সর্বদা নিখিল বস্তুতে প্রকাশরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইহাতে অহঙ্কারই বা কি এবং কোথা হইতেই বা উত্থিত হইবে? জলে কোথায় বা ধূলি উত্থিত হইয়া থাকে? অনলেই বা কোথায় জল উত্থিত হইয়াছে? অতএব হে পুত্র! "আমি সেই এই (দেহ)" ইত্যাকার ভ্রমবিলাস পরিত্যাগ কর। এইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান অতি তুচ্ছ, পরিমিত এবং দিক ও কালের বশীভূত; এই জ্ঞান কদাচ বাস্তব নহে। বাস্তবপক্ষে তুমি দিক্-কালাদিরূপে অপরিচ্ছিন্ন, স্বচ্ছ, নিত্য, উদিত, বিশাল সর্বময় ও একমাত্র নির্মল চৈতন্য। চতুর্দিকস্থ ফল, কুসুম ও পল্লবের একীভাবাপন্ন রস যেমন মধু, সেইরূপ তুমি সর্বদাই এই জগৎ সমূহের সার নিরতিশয় আনন্দময় চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিত, তুমিই সর্বদা নির্মলতর অনন্ত চিদাত্মা; হে কচ! তুমি সত্তারূপী; তোমার এই অহঙ্কার-জ্ঞান আবার কি? (৬১ ১১১)। বশিষ্ঠ কহিলেন,—দেবগুরুতনয় কচ পিতার নিকট এইরূপ উৎকৃষ্ট উপদেশরূপে পরমযোগ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে জীবন্মুক্ত হইয়া উঠিলেন। হে রাম! প্রশান্তবুদ্ধি কচ যেরূপ মোহগ্রন্থি ছেদন করিয়া নির্মম ও অহঙ্কারশূন্য হইয়াছেন তুমিও সেইরূপ হইয়া নির্বিকার ভাবে অবস্থান কর। (৬।(১)।১১২)।

উল্লিখিত কাহিনী যোগবাশিষ্ঠের পদ্ধতির একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। ঐখানে অহংকে যেরূপে ভ্রান্তি বলা হইয়াছে, উহা মহাযান বৌদ্ধ দর্শনেরই অনুরূপ—উহার মধ্যে সত্য রহিয়াছে। এই ভ্রান্তিমূলক অহংজ্ঞান বর্জন করা গীতারও শিক্ষা, "আমি" "আমার" এই মিথ্যাজ্ঞান বর্জন করাই মুক্তির উপায়। কিন্তু এই ভ্রান্ত "অহং" এবং জীবাত্মা এক নহে, জীব ও জগৎ ইহাদের কোনটিই ভ্রান্তি নহে, গীতা জীবকে ভগবানের সনাতন অংশ

বলিয়াছে। ভ্রান্ত অহংজ্ঞান দূর হইলে, জগৎ লুপ্ত হয় না, পরন্তু আমরা আমাদের প্রকৃত "অহংএর" সন্ধান পাই এবং জগৎকেও তাহার প্রকৃত স্বরূপে দেখিতে পাই—তখনই জ্ঞানের সহিত মুক্তভাবে সংসারে থাকিয়া সংসারে ভগবানের ইচ্ছাপূরণের যন্ত্র রূপে কর্ম করা যায়, সংসারকে দিব্য ভাবে উপভোগ করা যায়। যোগবাশিষ্ঠ একদিকে জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছে, অন্যদিকে জগৎকে পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে বলিয়াছে—এই দুইটির সমন্বয় করা যায় না। যোগবাশিষ্ঠের যুক্তি এই যে, সংসারের ভোগ সুখ সবই যখন মিথ্যা তখন আর সে-সব ত্যাগের সার্থকতা কি? "ফলতঃ অহঙ্কারের ত্যাগই হইতে পারে না; অসৎ শশশৃঙ্গের আবার ত্যাগই বা কি আর গ্রহণই বা কি"? (৬(১)। ১১২) এরূপ যুক্তির একটা বিপদ আছে, লোকে পাপ পূণ্যের প্রভেদকেও মিথ্যা মায়া বলিয়া প্রকৃতির প্রবল পাশব প্রেরণা-সকলকে প্রশ্রয় দিয়া নীচ ভোগে মগ্ন হইতে পারে, এবং একটা মৌখিক আধ্যাত্মিকতার দ্বারা তাহার সমর্থন করায় সেই অবস্থা হইতে উঠা তাহাদের পক্ষে একরকম অসম্ভব হইতে পারে। বস্তুতঃ ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এইরূপ বিভ্রাট দেখা গিয়াছে। শান্ত সংযত দার্শনিক বৌদ্ধধর্মও নিম্ন প্রকৃতির প্রেরণায় নানারূপ ব্যাভিচার উৎপন্ন করিয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের যুক্তি তাহাতে প্রশ্রয় দিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। যোগবাশিষ্ঠ জীবন্মুক্ত নর নারীর দাম্পত্যজীবন, এমন কি যৌনমিলনেরও যে কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছে তাহাতে কালিদাসের যুগেরই প্রভাব দেখা যায়। আধ্যাত্মিকতার সহিত পূর্ণ ভোগময় জীবনের সমন্বয় করাই যোগবাশিষ্ঠের আদর্শ। এমন কি গ্রন্থকার ভোগসুখের জন্য এই পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে যাওয়ারও বিরোধী। জীবন্মুক্তা রাণী চূড়ালার সাহায্যে তাঁহার স্বামী রাজা শিখিধ্বজও যখন জ্ঞান-লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন তখন চূড়ালা তাহাকে বলিলেন, "হে পুরুষো-ত্তম! আমরা বিষয়ভোগের আদি, মধ্য ও অবসানে যেরূপ আছি, সেইরূপ থাকিয়া কেবল শেষটুকু পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতেছি। হে প্রভো! এক্ষণে আমাদের অবশিষ্ট জীবনকাল বর্তমান রাজ্যভোগেই অতিবাহিত করিয়া ক্রমে যথা সময়ে বিদেহমুক্তি লাভ করি। হে রাজসত্তম! আমরা আদি, মধ্য ও অবসান কোন কালেই রাজা নহি। পূর্বে আমরা রাজা এইরূপ মোহই কেবল আমাদের বেশী ছিল, সেই মোহমাত্র ত্যাগ করিয়া পূর্ববৎই রহিয়াছি। তুমি স্বনগরে রাজা হইয়া নিজ আসনে উপবেশন কর; আমি তোমার রমনীরত্নস্বরূপ মহিষী হই। পতাকা পরিশোভিত আমাদের রাজপুরী তূর্য্যনিনাদে প্রতিধ্বনিত হউক, চতুর্দিকে পুষ্প বিকীর্ণ হইতে থাকুক,

অধিবাসিগণ আনন্দে মত্ত হউক, সুন্দরী নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে থাকুক, এবম্প্রকারে আমাদের রাজপুরী পুষ্পোপরি মধুকর-গুঞ্জনায়িত মঞ্জরী-শোভিত অভিনব লতাবিতানশোভিত বসন্তলক্ষ্মীর সুষমা ধারণ করুক।" বশিষ্ঠ কহিলেন, চূড়ালা কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া বিগতজ্বর শিখিধ্বজ রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া অক্ষুব্ধভাবে মধুর বচনে কহিলেন,—"অয়ি বিশালাক্ষি! যদি এইরূপই হইল, তবে স্বর্গলোকে সিদ্ধগণের যে ভোগ সম্পত্তি তাহা আমাদের আয়ত্তীভূত, তাহা ভোগ করিতে ক্ষতি কি? হে প্রিয়ে! তাহাই কেন করি না?" চূড়ালা কহিলেন,হে রাজন! ভোগেও আমার বাঞ্ছা নাই, ঐশ্বর্য্যেও আমার কামনা নাই। কেবল স্বভাবের বশে যথাপ্রাপ্ত বিষয় লইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। আমার নিকট স্বর্গও সুখকর নহে, কোন কার্য্যই আমার সুখকর নহে। আমি স্বস্থচেষ্টিত হইয়া যথাস্থিত ও অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিতে চাই। "ইহা সুখ" "ইহা সুখ নহে" এইরূপ দ্বন্দ্ব আমার নাই। আমি শান্ত পরমপদে যথাসুখে অবস্থান করিতেছি। শিখিধ্বজ কহিলেন,—অয়ি! বিশালাক্ষি! তুমি সমবুদ্ধিতে ঠিক যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছ, আমাদের রাজ্য-ত্যাগেই বা কি, গ্রহণেই বা কি, কিছুতেই ক্ষতি নাই। আমরা সুখ-দুঃখ দশার ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্বেষশূন্য হইয়া যথাস্থিত স্বস্থভাবেই অবস্থান করিতেছি। সেই প্রাচীন দম্পতিদ্বয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তায় দিবা-বসান হইয়া গেল। অনন্তর তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াও অনুৎকুণ্ঠিতভাবে (পরস্পরের অভিলষিত ভোগের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াও বাসনা নাই বলিয়া উৎকন্ঠাশূন্য) যথাপ্রাপ্ত দিবসব্যাপার শেষ করিলেন। কার্য্যজ্ঞ পূর্ণচিত্ত জীবন্মুক্ত সেই দম্পতিদ্বয় স্বর্গভোগেও অবহেলা করিয়া এক শয্যায় শয়নপূর্বক সেই সেই প্রণয়চেষ্টায় রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রণয়ীদিগের বুদ্ধির উৎকন্ঠাদায়িনী সেই দীর্ঘ-রজনী তাঁহারা প্রণয়মধুর ভোগ-মোক্ষ-সুখের কথায় মুহূর্ত্তকালের মত অতিবাহিত করিয়া দিলেন। (৬(১)।১০৯)।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে যে এই পৃথিবীতেই সমৃদ্ধিশালী রাজ্যসুখ ভোগ করিতে বলিয়াছিলেন, ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্, যোগবাশিষ্ঠ এইভাবেই সেই আদর্শের ব্যাখ্যা করিয়াছে। কিন্তু গীতা যে সমগ্র তত্ত্বজ্ঞানের উপর এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং যে যোগ-সমন্বয়কে এই সিদ্ধিলাভের উপায় বলিয়াছিল, যোগবাশিষ্ঠ সেটি ধরিতে পারে নাই। গীতার তত্ত্বজ্ঞান সুস্পষ্ট দার্শনিক আলোচনার দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় নাই, গীতাকার অধ্যাত্ম সত্যকে সমগ্রভাবে যেমন দর্শন করিয়াছিলেন

শক্তিপূর্ণ ভাষায় সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করিয়া কার্য্যকরী সাধনারই উপর জোর দিয়াছিলেন—গীতা দর্শনশাস্ত্র নহে, যোগশাস্ত্র। কিন্তু পরে যে দার্শনিক চিন্তা ও আলোচনার যুগ আসে তাহাতে গীতার শিক্ষা অপেক্ষা বৌদ্ধ দর্শনই ভারতবাসীকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছিল। যোগবাশিষ্ঠের মধ্যে আমরা তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। কিন্তু তখনও সেই যুগের কর্ম ও ইন্দ্রিয়ভোগের প্রবৃত্তি প্রবল ছিল, তাই যোগবাশিষ্ঠ বৌদ্ধদর্শনকে ভিত্তি করিয়া ভোগ ও মোক্ষকে মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এই ভিত্তি খুবই দুর্বল—শঙ্করাচার্য্য সহজেই ইহা খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাস আদর্শকেই ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়ে ভারতবাসীর জীবনীশক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসায় ভারতবাসী শঙ্করের শিক্ষা সহজে ও স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল।

ইহার বিপরীত দিকে ঐ সময়ে চেষ্টা করিয়াছিল তন্ত্র। তন্ত্র বৌদ্ধগণের ন্যায় জগৎকে শূন্য বা মিথ্যা বলে নাই এবং এই সংসারেব মধ্যে থাকিয়া ভোগের মধ্য দিয়াই কেমন করিয়া মোক্ষলাভ কবা যায় সে-সম্বন্ধে শক্তিশালী সাধন পন্হার বিকাশ করিয়াছিল। কুলার্ণব তন্ত্রে বলা হইয়াছে,

ভোগো যোগায়তে সম্যক্ দুষ্কৃতং সৎকৃতায়তে।
মোক্ষায়তে চ সংসার কুলধর্মে কুলেশ্বরী ॥

"হে কুলেশ্বরি! কুলধর্মে ভোগই হয় পূর্ণযোগ, দুষ্কর্মই সৎকর্মে পরিণত হয়, এবং সংসারই হয় মোক্ষলাভের স্থান।" কিন্তু তান্ত্রিকেরা দার্শনিক যুক্তি-তর্কের দ্বারা বৌদ্ধদর্শন বা শাঙ্কর দর্শনকে খণ্ডন করিতে পারেন নাই, তাহা ছাড়া তাঁহারা যে-সকল জিনিষ মানুষকে অধঃপতিত করে সেইগুলির সাহায্যেই মানুষকে উর্দ্ধে তুলিবার দুষ্কর প্রয়াস করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক সাধনার নীতি হইতেছে—

যৈরেব পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা।
শ্রীকৌলদর্শনে চৈব ভৈরবেণ মহাত্মনা ॥

—কুলার্ণব তন্ত্র

"শ্রীকৌলদর্শনে মহাভৈরব নির্দেশ দিয়াছেন যে যে-সকল জিনিষ মানুষের অধঃপতনের কারণ হয় সেইগুলির দ্বারাই পরম অধ্যাত্ম সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে।"

এই সাধনা সহজেই ব্যাভিচারে পরিণত হইয়াছিল—তাই তন্ত্র পিছনে থাকিয়া ভারতীয় জীবন ও সাধনাকে প্রভাবিত করিলেও মায়াবাদ ও সন্ন্যাসবাদকে জয় করিতে পারে নাই।

গীতা যে সূত্র দিয়াছিল সেইটিকে ধরিয়াই আজ আবার এক মহত্তর সমন্বয়ের দিন আসিয়াছে এবং শ্রীঅরবিন্দের যোগ হইতেছে তাহারই মূর্ত্ত প্রকাশ। এই জগৎ যে মিথ্যা নহে, সচ্চিদানন্দ ভগবান নিজের স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দকে বিচিত্রভাবে উপভোগ করিবার জন্য নিজের মধ্যেই নিজ চিৎ-শক্তির দ্বারা এই বিচিত্র জগৎ অভিব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা যোগলব্ধ দিব্য দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিয়া তিনি গভীর যুক্তিতর্কের দ্বারাও বুদ্ধির নিকট সু-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং এই সংসারের জীবনকে কেমন করিয়া অধ্যাত্ম-ভাবে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য জীবনে পরিণত করা যায় তাহার কার্য্যকরী প্রণালী স্বরূপ এক অভিনব সমন্বয়মূলক যোগ বা অধ্যাত্ম সাধনার বিকাশ করিয়াছেন—তাহা দ্বারা মানুষ শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নহে পরন্তু সমষ্টিগত, জাতিগত ভাবে এক নূতন দেবজাতিতে পরিণত হইবে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।

আমাদের যে মূল সত্তা তাহাতে আমরা বিশ্বের অতীত, দেশ ও কালের অতীত ব্রহ্মের সহিত এক, শাশ্বত, অক্ষর। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম সত্তাও রহিয়াছে, পরমাত্মাই প্রত্যেক জীবের জীবাত্মা হইয়াছেন—ইহাও শাশ্বত সনাতন, ইহা বহু জন্ম, বহু লোকের ভিতর দিয়া বিচিত্র ভাবে আত্মানন্দ উপভোগ করিতেছে—ইহাও জন্ম মৃত্যুর অতীত, যে দেহ, প্রাণ, মনকে ধরিয়া ইহা আত্মবিকাশ করে তাহাদেরই বিনাশ ও পরিবর্তন হয়। আমরা যে ক্ষণস্থায়ী জীব নহি, আমরা যে অসীম অনন্ত—এইটি উপলব্ধি করাই হইতেছে অধ্যাত্মজীবনের, দিব্যজীবনের প্রথম কথা। সেই আভ্যন্তর প্রতিষ্ঠা হইতে আমাদের বাহ্য জীবনকে, বাহ্য কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে দ্বিতীয় কথা। এই উপলব্ধি ও রূপান্তর সম্ভব হয় যদি আমরা এখন যে বাহ্য ইন্দ্রিয়ভোগে অতিমাত্রায় আসক্ত হইয়া রহিয়াছি ইহা হইতে সরিয়া অন্তর্মুখী হই—ইহারই জন্য সর্বদা সেই আভ্যন্তর আত্মার সহিত যোগ সাধনা আবশ্যক হয়। ইহার জন্য দেহের জীবনকে যে ছাড়িয়া দিতে হইবে বা অবহেলা করিতে হইবে তাহা নহে। তবে সকল প্রকার আসক্তি ও বাসনা বর্জন করিতে হইবে, "আমি" "আমার" ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। "অপরিগ্রহ" শব্দের অর্থ নহে যে, বাড়ী ঘর সব ছাড়িয়া দিতে হইবে, এমন কি অঙ্গ আচ্ছাদনের কন্হাটি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে, পরন্তু দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহা কিছু ব্যবহার করি—তাহাতে "আমি" "আমার" ভাব যেন না থাকে, আসক্তি না থাকে। এইরূপ অনাসক্তি ও আত্মজ্ঞান অভ্যাস করিবার জন্য যে স্থান

ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হয় তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সাধারণ সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া কোন সদ্‌গুরুর আশ্রমে থাকিয়া সাধনা করাই সমীচীন। এই সাধনার দ্বারা আমরা অন্তরের মধ্যে শাশ্বত আত্মার সন্ধান পাইব শুধু তাহাই নহে, আমাদের বাহ্য চৈতন্য ও জ্ঞানেরও প্রসারতা হইবে, আমাদের কর্মের শক্তি ও ক্ষেত্রও বর্দ্ধিত হইবে তখন আমরা আমাদের দেহ, প্রাণ, মনের এই পার্থিব জীবনকে উন্নত ও রূপান্তরিত করিয়া দিব্যজীবনে পরিণত করিব। তখন আমাদের কর্ম ও জীবনযাত্রা পূর্বজন্মের কর্মের দ্বারা বা নিম্নতন প্রকৃতির দ্বারা অবশভাবে নিয়ন্ত্রিত বা চালিত হইবে না (যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতির জীবন্মুক্তের জীবন এইভাবেই চালিত), পরন্তু আমরা স্বাধীন ভাবে আমাদের প্রকৃতির প্রভুরূপে জীবনলীলা করিব—একমাত্র অন্তর্য্যামী ভগবান ছাড়া আর কাহারও নিকট বা কিছুরই নিকট আমাদের কোন বন্ধন বা অধীনতা থাকিবে না। ইহাই পূর্ণমুক্তি ও পূর্ণযোগ।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২

অন্বয়।—শুচৌ দেশে স্থিরং ন অত্যুচ্ছ্রিতং ন অতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ আত্মনঃ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র (আসনে) উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ আত্মবিশুদ্ধয়ে যোগং যুঞ্জ্যাৎ।

অনুবাদ।—যোগী বিশুদ্ধ স্থানে নিজ স্থির আসন স্থাপন করিবেন, তাহা যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়; প্রথমে কুশ, তদুপরি মৃগচর্ম, তাহার উপরে চেল (পশমী বা রেশমী) বস্ত্র আচ্ছাদন করিবেন। তিনি সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া মনকে একাগ্র এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসকলকে সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবেন।

ব্যাখ্যা

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য। গীতা কর্মযোগকে অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরে সমর্পিত কর্মকে আত্মশুদ্ধির উপায় বলিয়াছে। তাহারই সহায়স্বরূপ এখানে দুইটি শ্লোকে রাজযোগের অঙ্গ আসনের বর্ণনা করিতেছে। বিশুদ্ধ স্থানে এই আসন রচনা করিতে হইবে, দুর্গন্ধ আবর্জনাদি হইতে মনের বিক্ষেপ হয় অতএব যে-স্থানে স্বভাবতঃ এই সব নাই, অথবা যে-স্থান হইতে সংস্কারের দ্বারা এই সব দূর করা হইয়াছে সেইখানে আসন পাতিয়া যোগা-

ভ্যাস করিতে হইবে। গীতার এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন গোময়াদি বিলেপনের দ্বারা স্থান শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুগণ গোবরকে অতি পবিত্র বস্তু জ্ঞানে সকল ধর্ম্মকর্ম্ম এবং গৃহসংস্কারে উহা ব্যবহার করিয়া থাকে। একটা জন্তুর মল হিন্দুগণের নিকট কেন এত পবিত্র হইয়া উঠিল ইহা অতি রহস্যময়। কেহ কেহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়া বলেন, গোবরের জীবাণুনাশক শক্তি আছে। কিন্তু তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে বর্তমান যুগে যে-সব দেশ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে সেখানে গোবর একটি জীবাণুনাশক বস্তু হিসাবে কোথাও ব্যবহৃত হয় না কেন? আর গোবরের যে গুণই থাকুক, অসুস্থ রুগ্ন গরুর মলমূত্র যে রোগজীবাণুতে পূর্ণ থাকে, এবং সুস্থ গরুর মলেও যে নানা বিষাক্ত জিনিষ থাকিতে পারে সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই--অতএব গোবরকে সংস্কার কার্য্যের জন্য ব্যবহার করা আদৌ নিরাপদ নহে। *

গীতা বলিয়াছে যুগে যুগে ধর্মে নানা গ্লানি প্রবেশ করে, যোগাঙ্গের মধ্যে গোময়ের প্রবেশ এইরূপ গ্লানির একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ বেদ, উপনিষদ, গীতা কোথাও গোবরের পবিত্রতার কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতাতেও গোবরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয় নাই। রাজযোগের মূল শাস্ত্র পাতঞ্জল দর্শনে শৌচ হইতেছে একটি নিয়ম, সেই হিসাবে যোগের অঙ্গ। সাধনপাদ ৩২ সূত্রে "শৌচ" শব্দের ব্যাখ্যায় ব্যাস বলিয়াছেন, তত্র শৌচং মৃজ্জলাদিজনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাদি চ বাহ্যম্। আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনম্। অর্থাৎ মাটি ও জল আদি জনিত ও মেধ্যাহার † প্রভৃতি যে শৌচ, তাহা বাহ্য। আভ্যন্তর শৌচ চিত্ত-মল-ক্ষালন। গোবরের দ্বারা স্থান বিশুদ্ধ বা পবিত্র করা যায় ভাষ্য-কারের তাহা অভিমত হইলে তিনি শুধু মাটি ও জলের উল্লেখ না করিয়া প্রথমেই গোময়ের উল্লেখ করিতেন। কিন্তু এখন বাহ্য ও আভ্যন্তর শুচির প্রধান উপকরণ হইয়াছে গোবর। কেহ যদি কোন অন্যায় কর্ম করিয়া

---

* পল্লীগ্রামে হিন্দুগণ গোবর দিয়া মাটির ঘর নিকাইয়া থাকে। কিন্তু শুধু জল দিয়া মুছিলে অথবা ভাল মাটি দিয়া লেপিলে মাটির ঘর ও দেওয়াল বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে—সাঁওতালেরা ও মুসলমানেরা এই ভাবেই মাটির ঘর সুমার্জ্জিত করে।

† পঁচা দুর্গন্ধ, মাদক, অস্বাভাবিকরূপে কোন শরীর যন্ত্রের উত্তেজক, এরূপ দ্রব্যসকল অমেধ্য।

পাপগ্রস্ত হয়, তাহারও আভ্যন্তর শৌচের জন্য ব্যবস্থা করা হয় কিঞ্চিৎ গোবর ভক্ষণ।

গরু ও গোবরের মাহাত্ম্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে মহাভারতে অনুশাসনপর্বে দানধর্ম প্রসঙ্গে। সে-স্থানটি পাঠ করিলে আশঙ্কা হয় যে, আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মহাভারতের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিবেন। নিখিল সৌন্দর্য্য ও সুষমার অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী আসিয়া গাভীগণের নিকট আবেদন জানাইলেন, তিনি তাহাদের দেহের মধ্যে অবস্থান করিতে চান। চঞ্চলা অস্থিরমতি লক্ষ্মীকে দেহমধ্যে স্থান দিতে গাভীগণ কিছুতেই সম্মত হয় না। লক্ষ্মীও নাছোড়বান্দা—তাঁহার অনেক কাকুতিমিনতির পর গাভীগণ সন্তুষ্ট হইয়া বরদান করিলেন—"আমাদের মল ও মূত্র অতিশয় পবিত্র, তুমি তাহার মধ্যে বাস করিতে পার।" লক্ষ্মী কৃতার্থ হইয়া গাভীগণকে অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তদবধি ঐ পবিত্র বস্তুদ্বয়ের মধ্যে নিজ চির আবাস ঠিক করিয়া লইলেন।

যাহাদের মল মূত্র এত পবিত্র তাহারা নিজে কত মহান তাহা বলাই বাহুল্য। মহাভারতে বলা হইয়াছে,

দেবানামুপরিষ্টাচচ গাবঃ প্রতিবসন্তি বৈঃ,

গাভীসকল দেবতাদের ঊর্দ্ধে বাস করে, তাহাই গোলোক, শ্রীবিষ্ণুর পরম ধাম। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সংসারে যে-বস্তু পবিত্র বস্তু-সকল মধ্যেও পবিত্রতম, উত্তম ও পরম পাবন তাহার বর্ণনা করুন। ভীষ্ম কহিলেন, গাভীসকল হইতেছে মহান অর্থের সাধন, পরম-পবিত্র এবং মানুষের ত্রাণ-কর্তা। গাভীদের এইরূপ উচ্চপদ লাভের কারণ এই যে, তাহারা এক লক্ষ বৎসর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর প্রার্থনা করিয়াছিল—"এই সংসারে দানযোগ্য যত বস্তু আছে আমরা যেন তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হই। আমাদিগকে যেন কোন দোষ স্পর্শ না করে। মানুষ আমাদের গোবরে স্নান করিয়া যেন সদা পবিত্র হয়, দেবতা ও মানব পবিত্রতার জন্য যেন আমাদের গোবর ব্যবহার করে। সমস্ত চরাচর প্রাণী যেন আমাদের গোবরে পবিত্র হয় এবং যে-সব মনুষ্য আমাদিগকে দান করিবে তাহারা যেন আমাদের উত্তমধাম (গোলক) প্রাপ্ত হয়।" ব্রহ্মা বর দিলেন, "তোমাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ হোক, তোমরা জগতের জীবসকলকে উদ্ধার করিতে থাক।"

হিন্দুদের উপর মহাভারতের প্রভাব অসীম, অতএব কেন হিন্দুরা গরু ও গোবরকে এত পবিত্র জ্ঞান করে তাহার কারণ বুঝা গেল। কিন্তু এই

সব আজগুবী গল্প মহাভারতের মধ্যে কেমন করিয়া আসিল? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা হিন্দু সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের অনেক তথ্যই জানিতে পারি। বৈদিক যুগে গরুই ছিল আর্য্যগণের প্রধান সম্পদ, গাভী হইতে দধি দুগ্ধ ঘৃত ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যাইত, বৃষসকল চাষের কাজে এবং যানবাহনের কাজে লাগিত, এমন কি মুদ্রার অভাবে গরুর আদান প্রদানের ভিতর দিয়াই জিনিষপত্র কেনা বেচা চলিত। অতএব গোধন সকলেরই আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। জগতের অন্যান্য স্থানেও প্রাচীন কালে গরু প্রধান সম্পত্তি ছিল, কিন্তু ভারতে গরু পবিত্র বলিয়া গণ্য হইবার মূল কারণ হইতেছে যজ্ঞে গরুর উপযোগিতা এবং বেদে পুনঃ পুনঃ গো-মাহাত্ম্য প্রচার, গো-শব্দের উল্লেখ। যজ্ঞই ছিল প্রাচীন আর্য্য-গণের জীবনের কেন্দ্র, গীতাতেই বলা হইয়াছে, যে-কার্য্যের সহিত যজ্ঞের সম্বন্ধ নাই তাহা বৃথা, তাহা বন্ধন স্বরূপ। মহাভারতে গরুকে বলা হই-য়াছে যজ্ঞমূল, যজ্ঞের অঙ্গ এবং সাক্ষাৎ যজ্ঞস্বরূপ। প্রাচীন কালে যজ্ঞের জন্য গরু বলিদান দেওয়া হইত, সোমরসের সহিত গোদুগ্ধ মিশাইয়া তাহা দেবতাগণকে অর্পণ করা হইত। গরুর এই সব উপযোগিতার জন্য আর্য্যগণ যজ্ঞ করিয়া দেবতাদের নিকট হইতে গোধন প্রার্থনা করিতেন। ঋগ্বেদে এমন বিখ্যাত মন্ত্র খুব কমই আছে যেখানে দেবতাদের নিকট হইতে গোধন প্রার্থনা না করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। বেদ শুধুই দেবতাদের নিকট হইতে বাহ্য ভোগ ঐশ্বর্য্য প্রার্থনার গ্রন্থ নহে। যাহারা বেদের এইরূপ অর্থ করে গীতা তাহাদের মতকে বেদবাদ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। বেদ বাহ্যিক যজ্ঞের ভাষা প্রয়োগ করিলেও তাহার এক নিগূঢ় অর্থ ছিল, অধ্যাত্ম জ্ঞান, অধ্যাত্ম শক্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া পৃথিবীর এই মর্ত্যজীবনকে অমৃতত্বে পরিণত করা, মর্ত্ত্যেষ্বমৃতং। এই যে অধ্যাত্ম জ্ঞানের জ্যোতি, ইহা বুঝাইতেই বেদ পুনঃ পুনঃ 'গো' শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, কারণ প্রাচীন অধিকাংশ শব্দের ন্যায় এই "গো" শব্দেরও বহু অর্থ ছিল, এবং ইহার একটি অর্থ যেমন গরু, গাভী, অন্য একটি অর্থ ছিল, রশ্মি, জ্যোতি। প্রাচীন আর্য্য-গণ যজ্ঞ করিয়া দেবতাগণের নিকট গরু, গোধন প্রার্থনা করিত, কিন্তু সেটা ছিল নিম্ন অধিকারীদের পক্ষে; পরন্তু উচ্চতর অধ্যাত্ম সাধকগণ পরাজ্ঞানের জ্যোতি প্রার্থনা করিত। "গো" "বৃষভ" এই সব শব্দ ভগবতী ও ভগবানের উপমা হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা

তদিন্বস্য বৃষভস্য ধেনোরা নামভির্মমিরে সক্ম্যং গোঃ।

—ঋগ্বেদ ৩।৩৮।৭

অর্থাৎ ভগবান নিজ শক্তি দ্বারা নিজ সত্তা হইতে এই নামরূপময় জগৎ প্রকট করিয়াছেন। অন্যত্র—

বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্যোজসা।
ঈশানো অপ্রতিকুতঃ ।।—ঋগ্বেদ ১।৭।৮

"বৃষরাজ আনন্দের জন্য চলে যেমন গোযূথের প্রতি, তেমনি এই সর্বশক্তিময় পুরুষ আপনাকে অনাবৃত করিয়া সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন কর্মীসংঘের প্রতি।" (মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা)

কিন্তু শুধু এইরূপ উপমা হিসাবে নহে, সাক্ষাৎভাবেও "গো" শব্দ পরাজ্ঞানের জ্যোতি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে—

ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্য্যং রোহয়দ্দিবি।
বি গোভিরদ্রিমৈরযৎ ।।—ঋগ্বেদ ১।৭।৩

"দূরদৃষ্টির জন্য ইন্দ্রই সূর্য্যকে দ্যুলোকে উঠাইয়া ধরিয়াছেন, পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া সাথে সাথে জ্যোতিরাজী ছড়াইয়া দিতেছেন।" এখানে 'গো" শব্দে "গরু" বুঝাইলে বলিতে হয় ইন্দ্র পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া গরু ছড়াইয়া দিতেছেন এবং ইহার কোন অর্থই হয় না। বস্তুত এখানে পাহাড় হইতেছে স্থূল চেতনার কঠিন আবরণ এবং "গো" হইতেছে জ্ঞানরশ্মি। পরে বলা হইয়াছে,

সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র ত্বাদাতমিদ্‌যশঃ।
গবামপ ব্রজং বৃধি কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ ।।—ঋগ্বেদ ১।১০।৭

"হে ইন্দ্র! উদারপ্রসারিত নিষ্কলঙ্ক তোমার দান যে বিজয়শ্রী। হে বজ্রধারী। আলোকযূথের আবাস উন্মুক্ত করিয়া ধর, আনন্দ-ধন কর সৃষ্টি।" এখানে "গবাং ব্রজং" বলিতে যদি গরুর খোঁয়াড়ই বুঝায় তবে তাহা খুলিবার জন্য বজ্রধারী ইন্দ্রকে আহ্বান করিবার কোনই অর্থ থাকে না। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন এই পৌরাণিক কাহিনীটি বেদের একটি রূপক হইতে গৃহীত—

অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ।
প্রাবো বাজেষু বাজিনং ।।—ঋগ্বেদ ১।৪।৮

"ইহা (সোমরস) পান করিয়া, হে শতকর্মী। তুমি হইয়াছিলে বৃত্রদের হন্তা, সকল ঋদ্ধির মধ্যে উপচিত করিয়া ধরিয়াছিলে ঋদ্ধকে।"

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত এই মন্ত্রটির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন —"সাধনার বাধারই অন্য নাম বৃত্র। বৃত্র অর্থে আবরণকারী (বৃ ধাতু হইতে), যাহারা অন্ধকার করিয়া থাকে—নীচের সেই সব অন্ধ-শক্তি যাহারা

জ্ঞানের জ্যোতি সাধকের মধ্যে খুলিতে দেয় না। ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া বৃত্রকে হনন করেন। অর্থাৎ বিশুদ্ধ তীব্র আনন্দে (সোমরস হইতেছে এই দিব্য আনন্দের প্রতীক) বিশুদ্ধ বুদ্ধির (ইন্দ্র এই বুদ্ধির দেবতা) তেজ যেন জ্বলিয়া উঠে এবং তাহাতেই অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইতে থাকে, সাধক পায় প্রাকৃত টানের সহিত যুদ্ধ করিবার, উপরে উঠিয়া চলিবার শক্তি। আনন্দমদিরায় সাধকের জ্ঞানময় পুরুষ জাগিয়া উঠে তাহার শত শক্তি লইয়া, সকল বাধা দীর্ণ করিয়া সাধককে সে লইয়া প্রতিষ্ঠিত করে পূর্ণতার সকল সিদ্ধির মধ্যে।" (মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা)

অন্যত্র ঋষি বলিয়াছেন সোম পান করিয়া ইন্দ্রের যে উল্লাস তাহা হয় গো-দাতা—

উপ নঃ সবনা গহি যেমস্য সোমপাঃ পিব।
গোদা ইন্দ্রেবতো মদঃ ॥—ঋগ্বেদ ১।৪।২

সাধারণ পূজকেরা ইন্দ্রকে সোমরস অর্পণ করিত এই আশায় যে ইন্দ্র উল্লসিত হইয়া তাহাদিগকে গোধন দান করিবেন। কিন্তু যাঁহারা বৈদিক নিগূঢ় সাধনায় দীক্ষিত ছিলেন তাঁহারা জানিতেন যে এই মন্ত্রে "গোদা" শব্দের অর্থ আলোক-দাতা।

ঋষি এক স্থানে বলিয়াছেন ধিয়াঃ গো-অগ্রাঃ (১।৯০।৫)। ধিয়াঃ শব্দের অর্থ চিন্তা-সকল, Thoughts, তাহারা গরুসকলকে সম্মুখে বহন করিতেছে—ইহার অর্থ কি? বস্তুতঃ এখানে গো-অগ্রাঃ অর্থ জ্যোতিরগ্রাঃ অর্থাৎ চিন্তাসকল পরাজ্ঞানের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। বস্তুতঃ বেদ অন্যত্র গো-অগ্রাঃ শব্দের পরিবর্তে জ্যোতিরগ্রাঃ শব্দই ব্যবহার করিয়াছে—

ত্রিস্রো বাচঃ প্রবদ্ জ্যোতিরগ্রাঃ
—ঋগ্বেদ ৮।১০১।১

শ্রীঅরবিন্দ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—Three powers of speach, that carry the Light in their front. (The Life Divine Vol II—XXVI).

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিলাম তাহা হইতে বুঝা যাইবে কেমন করিয়া "গো" ভারতীয় জনসাধারণের নিকট পবিত্র বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল—পুণ্যতম গ্রন্থ বেদে পুনঃ পুনঃ যাহা উচ্চারিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা পবিত্র বস্তু আর কি হইতে পারে? সাধারণ লোকে বেদের নিগূঢ় অর্থ না বুঝিয়া গরুকেই অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া ভাবিতে ও দেখিতে শিখিয়াছিল। গোলোক শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্যোতির্ময় লোক, সেখানে বিষ্ণুর আবাস।

লোকে বুঝিয়াছিল গোলোক হইতেছে গরুদেরই উচচতম ধাম। অবশ্য পণ্ডিতেরা সাধারণকে এইরূপই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এবং ইহারই প্রমাণ আমরা মহাভারতে পাই। কেন তাঁহারা এইরূপ করিয়াছিলেন এইবার তাহারই কিছু আলোচনা করিব।

বৈদিক যুগে যজ্ঞে গরু বলিদান দেওয়া হইত এবং আর্য্যগণ গো-মাংস ভক্ষণ করিতেন। আর্য্যগণ কৃষিজীবী হইবার পূর্বে পশুজীবী (Pastoral) ছিলেন। ঋগ্বেদের সময় আর্য্যগণ যেখানে বাস করিতেন সে দেশ ছিল শীতপ্রধান, বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ কালই ছিল শীতঋতু, তাই বৎসরকে হিম শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইত। কেহ বলেন সে-সময়ে আর্য্যগণ শীতপ্রধান উত্তরমেরুতে বাস করিতেন, পরে তাঁহারা ভারতে আসেন। আবার কেহ বলেন যে, ভারতেরই ঋতু তখন শীতপ্রধান ছিল, পরে নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনে ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইয়াছে। যাহাই হউক ঋগ্বেদের সময়ে মাংস এবং বিশেষ করিয়া গোমাংস যে বৈদিক আর্য্যদের একটি প্রধান খাদ্যদ্রব্য ছিল সে-বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে অতিথি সৎকারের জন্য বৃহৎ বৃষ হননের বিধান আছে (৩।৪,১।২)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও ঐরূপ বৃষ বা বন্ধ্যা গাভী বধ করিয়া রাজা বা অতিথির সৎকার করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে (১।৩।৪)। বিখ্যাত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য দুগ্ধবতী গাভীর মাংস খাইতেই অভ্যস্ত ছিলেন, শতপথ ব্রাহ্মণ (৩।১।২,২১)। বৃষ ও গাভীদিগকে হত্যা করিবার জন্য কসাইখানা ছিল (ঋগ্বেদ ১০।৮৯।১৪)। রামায়ণ মহাভারতের যুগ পর্য্যন্ত এইরূপ মাংসাহার ভারতে খুবই প্রচলিত ছিল এবং মাংসের দোকানগুলিতে খরিদ্দারের খুবই ভিড় হইত (মহাভারত, বনপর্ব, ২০৫ অধ্যায়, হরিবংশ ১৪৬-১৪৭)। মহাভারতে বনপর্ব ২০৬ অধ্যায়ে রন্তিদেব নামে এক রাজার উল্লেখ আছে, তাঁহার পাকশালায় প্রত্যহ ২০০০ গাভী হত্যা করা হইত, এবং ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিগণকে রন্ধিত মাংস সহ অন্ন বিতরণ করিয়া তিনি প্রভূত যশ অর্জন করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে বৈদিক আর্য্যগণের গোমাংস ভক্ষণে কোন আপত্তিই ছিল না। কালে মাংসাহারের বিরুদ্ধে মত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদের মধ্যেই অনেক স্থলে গাভীকে অবধ্য, অঘ্ন্যা, বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গাভী ও বৃষের ন্যায় এমন উপকারী জন্তুকে বধ করিয়া আহার করা অতি বর্বর প্রথা বলিয়া গণ্য হয়। ঋতু-পরিবর্ত্তনে ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইয়া উঠাতেও গোমাংস আহার অপ্রয়ো-

জনীয় এমনকি অনিষ্টকর বলিয়াই পরিদৃষ্ট হয়। বুদ্ধ কর্তৃক অহিংসাধর্ম প্রচারও মাংসাহারের বিরুদ্ধে মত গঠন করিতে সাহায্য করিয়াছিল। এই-ভাবে পরবর্তী যুগে গোবধ এবং গোমাংসাহার ভারতে একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। তবে এই কাজটি সহজে সংসিদ্ধ হয় নাই। কোন একটা জাতি বা সমাজ কোন বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে তাহা ত্যাগ করান আদৌ সহজ ব্যাপার নহে। আজও আমরা দেখিতে পাইতেছি ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গোমাংসাহার যে অপ্রয়োজনীয় শুধু তাহাই নহে, ইহা বিশেষ অনিষ্টকর। অর্থনীতির দিক হইতেও ইহাতে যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা বলিবার নহে। আর রাজনীতির ক্ষেত্রে এইটিই হইয়া দাঁড়াইয়াছে হিন্দুমুসলমান মিলনের প্রধান অন্তরায়। আজ যদি ভারতের মুসলমানেরা গোবধ এবং গোমাংসাহার বর্জন করে তাহা হইলে একদিনেই হিন্দুমুসলমানের ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে সমগ্র ভারতের যে সকল দিকে কত লাভ হয় তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ, আজ ইহা এত অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে যে, হিন্দুমুসলমান মিলনের প্রকৃষ্ট উপায়রূপে মুসল-মানগণকে গোবধ বন্ধ করার প্রস্তাব করিতেও কেহ সাহস করেন না। অতএব প্রাচীন ভারতে যাঁহারা গোবধ বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাদের সম্মুখে সমস্যাটা কি কঠিন ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মহা-ভারতেরই এক অংশে আমরা দেখিতে পাই, গোমাংস রন্ধন করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইতেছে এবং তাঁহারা এমন পরিতৃপ্তির সহিত উহা ভক্ষণ করিতেছেন যে একটু ঝোল পর্য্যন্ত পাতে পড়িয়া থাকি-তেছে না। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি কেন পরে ঐ মহাভারতেই* গো-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত আজগুবী কাহিনী-সকল রচিত হইয়াছিল। সে-যুগে ঐটিই ছিল লোকশিক্ষার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। এখনকার মত তখন লোকে এত তর্কযুক্তিপরায়ণ হইয়া উঠে নাই। যুক্তি অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষই তখন সত্যের প্রমাণ বলিয়া বিশেষভাবে পরিগণিত হইত। সাধা-রণে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জিনিষেই বিশ্বাস করিত এবং অতীন্দ্রিয় জিনিষ সম্বন্ধেও মুনিঋষিগণের অধ্যাত্মপ্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানে তাঁহাদের বাণীতেই বিশ্বাস করিত। কোন বিষয় যদি কাল্পনিক কাহিনীর দ্বারা স্থূল জীবন্তভাবে সাধারণের নিকট উপস্থিত করা হইত তাহা হইলে সেটি সহজেই তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইত। আজ এই যুক্তিতর্কের যুগেও আমরা দেখিতে পাই যুক্তি-

* খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মহাভারতের প্রাচীন ইতিহাস বর্ত্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছিল।

তর্ক অপেক্ষা কথার দ্বারা স্থূল চিত্র অঙ্কন করিতে পারিলে মানুষের মনকে বেশী প্রভাবিত করা যায়। আদালতে উকীলগণ তাহাদের মক্কেলের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে যদি একটি স্থূল বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী রচনা করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে সহজেই বিচারকগণকে তাহাতে বিশ্বাস করাইতে পারেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ বক্তারা অনেক সময়ে যুক্তি তর্ক অপেক্ষা জীবন্ত চিত্রাঙ্কনের দ্বারা জনসাধারণের মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেন।

তথাপি এইটি হইতেছে যুক্তিতর্কেরই যুগ—প্রাচীন কালের উপযোগী কথা ও কাহিনী বর্ত্তমানে অচল। সকল বিষয়ের সত্য-মিথ্যা তর্ক-যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে বর্ত্তমান যুগে তাহা সাধারণের গ্রাহ্য হয় না, যদিও স্থূল দৃষ্টান্ত ও চিত্রের সাহায্যে তথ্য-সকল সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিলে তাহা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। ভারতে গোবধ বন্দ করিবার সপক্ষে যুক্তি এমন প্রবল যে ঐসব কল্পিত কাহিনীর শরণ লইবার আর কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু উহা হিন্দুর ধর্মের সহিত জড়িত হইয়া পড়াতেই সমস্যাটি অতিশয় জটিল হইয়া পড়িয়াছে. মুসলমানেরা ভাবিতেছেন গোবধ বন্ধ করিলে হিন্দুধর্মকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, মুসলমান ধর্মকে আঘাত করা হইবে। বস্তুতঃ গোবধ বন্ধ করিলে মুসলমানধর্মের কোন হানিই হয় না, ভারতের মুসলমান সম্রাটগণ দেশে ঐক্য স্থাপনের জন্য গোহত্যা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গরু উৎসর্গ করিতেই হইবে, মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে এমন বিধান কোথাও নাই—বক্‌রীদ্* শব্দের অর্থ ছাগ উৎসর্গ, গরু উৎসর্গ নহে। অতএব যে কারণে ভারতীয় মুসলমান-গণের পূর্বপুরুষ বৈদিক আর্য্যগণ যজ্ঞে গোবধ এবং গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই কারণে তাহারাও আজ উহা করিতে পারেন। ভারতে গোবধ নিষিদ্ধ হওয়ায় সমগ্র মানবজাতির কি উপকার হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে মহাভারতের ঐসব আজগুবী কাহিনীর রচয়িতাগণকে দূরদর্শী মনীষী বলিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। গোজাতি যে মানুষের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য। যে দেশের গরু দুর্বল সে দেশের মানুষ দুর্বল এবং রুগ্ন। স্যার উইলিয়ম ওয়েজারবর্ণ বলিয়াছিলেন—"I can dream of a cattle without a nation but I cannot imagine of a nation without a cattle" —মানুষ নাই গরু আছে এই কথা আমি ভাবিতে পারি, কিন্তু গরু

* বক্‌রী—ছাগ বা ছাগী

নাই মানুষ আছে ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে যেমন উৎকৃষ্ট জাতির বৃষ পাওয়া গিয়াছে পৃথিবীতে আর কোথাও তাহা মিলে নাই। কোন একটি বৃক্ষে ভাল মন্দ নানা ফল হয়—কিন্তু দৈবাৎ কখনও দুই একটা অতি উৎকৃষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। ঐ ফলটি বীজ স্বরূপ রাখিয়া দিলে ক্রমশঃ ঐভাবে ঐ বৃক্ষের জাতের বিশেষ উন্নতি করা যায়; গরু প্রভৃতি সকল প্রাণী সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। যেখানে গোহত্যা গো-মাংসাহার প্রচলিত আছে সেখানে উৎকৃষ্ট বৎসগুলি নিহত হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী—ভারতে সেরূপ কোন সম্ভাবনা বহুকাল হইতেই নিরুদ্ধ হওয়ায় উৎকৃষ্ট বৎসসকল রক্ষা পাইয়াছে—ইহাতে মানবজাতির যে কত কল্যাণ হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

এইসব কথা যুক্তি তর্ক ও দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিলে আজ যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করিতেছে তাহাদিগকে ঐ অনিষ্টকর কর্ম হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দুরা এইটিকে তাহাদের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লওয়ায় সমস্যাটি অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় নেতাও বলিতেছেন, গো-রক্ষাই হিন্দুধর্ম। ইহার উত্তরে মুসলমানেরা বলিতেছেন, গোবধ করিবার, গোমাংস ভক্ষণ করিবার অধিকারই মুসলমানধর্ম। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, বস্তুতঃ গোরক্ষা হিন্দুর ধর্মের অঙ্গ নহে; যদি তাহাই হইত তাহা হইলে বেদ ও মহাভারতের অনেক অংশকে হিন্দুধর্ম হইতে বাদ দিতে হইত। বৈদিক আর্য্যগণও হিন্দু পর্য্যায়ের বাহিরে পড়িতেন। বস্তুতঃ হিন্দুর ধর্ম হইতেছে—আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে যে এক আত্মা বা ভগবান রহিয়াছেন তাঁহাকে জানা, তাঁহার সহিত সজ্ঞানে যুক্ত হওয়া, তাঁহার জ্যোতি, শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দে আমাদের এই জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-দুঃখময় মর্ত্যজীবনকে এই পৃথিবীতেই অমৃতত্বে পরিণত করা; আর যাহা কিছু তাহা হইতেছে অবান্তর, দেশকাল-পাত্র ভেদে সে-সবেরই পরিবর্তন হইতে পারে বা হইয়াছে—সে-সবকে সনাতন হিন্দুধর্মের অঙ্গ বলা যায় না।

গো-রক্ষাও ধর্ম, কিন্তু তাহা হইতেছে মানবধর্ম। গরুর ন্যায় উপকারী জীব, গর্ভধারিণী জননীর ন্যায়ই যে আমাদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়া আমাদের মাংসপেশী গঠন করিয়া দেয়, আমাদিগকে সুস্থ ও সবল রাখে তাহাকে বধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিলে আমাদের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির উপর অত্যাচার করা হয়, এবং তাহা পূর্ণতম মানবত্ব বিকাশের

পরিপন্থী হয়। যেখানে গোমাংস ভক্ষণ না করিলেও অনায়াসে জীবনধারণ করা যায় সে-সব দেশে গো-বধ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়াই মানবতার দিক হইতে অবশ্যকর্তব্য।

আমরা এতক্ষণ গরুর মাহাত্ম্যের কথাই আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু গোবর ও গোমূত্রের মাহাত্ম্যের কথা কিছু না বলিলে এই প্রসঙ্গটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। হিন্দু বহুকালের সভ্য ও ধর্মপ্রাণ জাতি, তাহাদের মধ্যে শৌচজ্ঞান অতিশয় প্রবল, এমন কি অনেক সময়েই তাহা মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, শুচিবাইয়ে পরিণত হইয়াছে। কোন একটি জন্তুর মলমূত্রকে যে হিন্দু অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কৃষি যখন প্রাচীন ভারতীয়গণের প্রধান উপজীবিকা হইল, এবং বহুদিনের ব্যবহারে জমীর স্বাভাবিক উর্বরতা কমিয়া আসিতে লাগিল তখন জমীতে সাররূপে গোবর ও গোমূত্রের উপযোগ অপরিহার্য্য হইল। তখন যাহাতে লোকে গোবর ও গোমূত্রকে ঘৃণা না করে সে-জন্যই শাস্ত্রকারগণকে নানা কাহিনী রচনা করিয়া মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থে সন্নি-বিষ্ট করিতে হইয়াছিল। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—"গোমূত্র ও গোবর দেখিয়া কখনও ঘৃণা করিও না।" ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, লোকে তখন ঐরূপ ঘৃণা করিত এবং তাহা দূর করিবার জন্যই ঐ সব কাহিনী রচিত হইয়াছিল। আর জমীতে গোবর ও গোমূত্রের সার দিলে শস্য বৃদ্ধি হয়, অতএব উল্লিখিত কাহিনীতে যে বলা হইয়াছে, লক্ষ্মী উহাদের মধ্যে বাস করেন ইহা একেবারে আজগুবী গল্প নহে, কারণ লক্ষ্মী হইতে-ছেন হিন্দুদের নিকট সম্পদের প্রতীক।

অবশ্য বর্তমানে ঐ-সব কাহিনীর আর কোন উপযোগিতাই নাই। বরং উহা দ্বারা গোঁড়ামী ও কুসংস্কারাদি প্রশ্রয় পাওয়ায় সমাজের অশেষ ক্ষতিই হইতেছে। মানুষ যতদিন অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিবে ততদিন তাহার মঙ্গলের জন্যই অনেক সময়ে সত্যের সহিত মিথ্যা মিশাইয়া দিতে হয়, কিন্তু এই মিথ্যার অশুভ ফল কালক্রমে অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এই জন্যই দেখা যায় সমাজের উন্নতি করিবার জন্য কোন প্রথা বা নিয়ম প্রচলিত করিলে কালক্রমে সেইটিই নানা অনর্থের সৃষ্টি করে। আর এই জন্যই অনেক দার্শনিক পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানবসমাজের উন্নতি সাধনের সকল প্রয়াসই হইতেছে কুকুরের লেজকে সোজা করিবার ন্যায় ব্যর্থ প্রয়াস। বস্তুতঃ হিন্দুসমাজকর্তাগণ যে দূরদর্শিতার ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন সে-সব অনুধাবন করিলে আজ আমরা বিস্মিত হই—অথচ সেই মুনি ঋষির ভারতবর্ষে মানুষের আজ কি

দুর্দশা ! আমাদের দেশের এক পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন—"প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ সমূহ যে-সব জাগতিক (world phenomena), ঐতিহাসিক জ্ঞান ও মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের উপর বর্তমান যুগের উপযোগী 'আধ্যাত্মিকতা' (Altruistic philosophy) প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।" অধ্যাপক মহাশয় "বৈজ্ঞানিক" মনোবৃত্তির ভিত্তিতে নবযুগের উপযোগী "আধ্যাত্মিকতা" প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রবচয়িতাগণের "বৈজ্ঞানিক" মনোবৃত্তির কোন অভাবই ছিল না এবং সে-যুগের পক্ষে যতটা সম্ভব বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধানেও তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং এইভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। মানুষ এখন যে অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছে তাহাতে তাহার সকল জ্ঞানই হইতেছে আপেক্ষিক (relative)—অর্থাৎ আংশিকভাবে, অসম্পূর্ণভাবে, সাময়িকভাবে সত্য—এবং এই আংশিক সত্যকে ধরিয়া ব্যক্তির ও সমাজের জীবনকে গঠন ও পরিচালন করিতে হয় বলিয়াই সকল ব্যবস্থার মধ্যেই গলদ বাহির হইয়া পড়ে—কোন Altruistic philosophy বা সমাজ-সেবামূলক দার্শনিকতা নিখুঁত হইতেই পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই, আজ যে তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে কিছুদিন পরে আবার তাহার বর্জন বা পরিবর্তন করিতে হইতেছে। অতএব ভারতের প্রাচীন মনীষীগণ বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে যে-সব কথা বলিয়াছিলেন সে-সবের যদি এখন সংশোধন করিয়া লওয়া প্রয়োজন হয় তাহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ছিল না। তবে তাঁহারা বাহ্য জগৎ অপেক্ষা অন্তর্জগতের সত্য সন্ধানের উপরে বেশী জোর দিয়াছিলেন—কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, মানুষের ভিতরটাকে ঠিক মত গঠন করিতে না পারিলে তাহার বাহিরের জীবন ও কর্ম কখনই পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। জাগতিক মূল তত্ত্বের সন্ধানে এবং মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতায় তাঁহারা যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন আধুনিক মানব এখনও তাহা ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। ফরাসী দেশের এক বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ্ বলিয়াছেন—মনোবিজ্ঞানের মূল কথাগুলি সবই ভারতে বহুকালপূর্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কেবল সেইগুলিকেই সাজাইয়া গুছাইয়া নূতনভাবে প্রকাশ করিতে পারেন।

প্রাচীনগণের চিন্তাধারা, ভাষা ও রচনাপদ্ধতি এখনকার তুলনায় অনেক বিভিন্ন ছিল, তাই তাঁহাদের বক্তব্য আমরা সকল সময়ে ঠিক মত ধরিতে

পারি না। নতুবা বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাইব তাঁহাদের অনেক কথা ও ব্যবস্থা কেবল সেই দেশ ও কালের উপযোগী হইলেও তাঁহারা এমন অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন যাহা সকল দেশ, সকল কালের উপযোগী—অতএব প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহকে একেবারে বিদায় দিয়া আধুনিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করা সমীচীন নহে। * আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মানুষ এখনও যে অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছে তাহাতে তাহার কোন সমস্যারই পূর্ণ সমাধান হইতে পারে না—যাহাতে সে বর্ত্তমান চৈতন্য হইতে উঠিয়া এক পূর্ণতর অধ্যাত্ম চৈতন্য ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহাই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা, অধ্যাপক মহাশয়ের ভাষায় Altruistic philosophy, এবং ইহার জন্য প্রয়োজন সকল রকম গোঁড়ামি বর্জন করিয়া মনকে খোলা রাখা, যেখান হইতে যতটুকু জ্ঞান বা আলোক পাওয়া যায় তাহা লইয়াই আমাদের আভ্যন্তরীণ চৈতন্যকে বিকশিত ও রূপান্তরিত করা।

প্রাচীনেরা সমাজের কোন ব্যবস্থা হিতকর বলিয়া মনে করিলে ধর্মের সহিত সেইটিকে যুক্ত করিয়া দিতেন—কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, মানুষের ধর্মভাব সহজাত এবং মজ্জাগত—আর ইহাতে কোনও দোষও ছিল না, কারণ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপরেই মানবসমাজ, মানব-জীবন পূর্ণতা লাভ করিবে। তবে বর্ত্তমানে মানব মন যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এখন আর সেই প্রাচীন পদ্ধতিসকল উপযোগী নহে—এখন মানুষের যুক্তিতর্ককে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে এবং গভীরতর আধ্যাত্মিকতার সহিত পরিচিত করিয়া দিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, গোবর ও গোমূত্রের ব্যবহার জনপ্রিয় করিবার জন্য আর লক্ষ্মীর গল্পের অবতারণা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অর্থনৈতিক উপযোগিতার কথা যুক্তিতর্কের দ্বারাই বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, এবং অন্যভাবে আধ্যাত্মিক দিক দিয়াও উহা সমর্থন করা যাইতে পারে। গীতা বলিয়াছে, এই বিশ্ব একটি যজ্ঞ স্বরূপ; দেব, প্রকৃতি, মানুষ পরস্পরের আদান প্রদানের ভিতর দিয়াই এখানে সকলে বর্দ্ধিত হইতেছে, পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ। যে-ব্যক্তি এই যজ্ঞচক্র অনুবর্ত্তন করে না, শুধুই গ্রহণ করে কিন্তু কিছু প্রত্যর্পণ করে না, দান করে না সে চোর, তাহার জীবনই ব্যর্থ। এই যজ্ঞচক্রের

* সম্প্রতি সোভিয়েট রুশিয়ায় মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সোভিয়েট মনীষি Prof. Kallanov বলিয়াছেন—'This great Hindu epic which is imbued with the spirit of love for the native land and the whole mankind, is topical to-day"—Moscow, June 23, 1943

দৃষ্টান্ত—উদ্ভিদ মাটি ও বায়ু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে, প্রাণীগণ ঐ উদ্ভিদকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতেছে অথবা উদ্ভিদভোজী অন্য প্রাণীকে আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, ঐ প্রাণী-সকলের মল মূত্র সাররূপে আবার মাটিতে ফিরিয়া আসিতেছে। এই যজ্ঞচক্র যদি ঠিক মত না চলে তাহা হইলেই অকল্যাণ হইবে। গীতা বলিয়াছে—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ৩।১০

—"প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমেই যজ্ঞের সহিত প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, এই যজ্ঞই তোমাদিগকে সকল অভীষ্ট ভোগ প্রদান করুক।" অতএব গোবর ও গোমূত্রের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইতেছে ঐ সবকে জমীতে সাররূপে প্রত্যর্পণ করা। যাহারা জ্বালানী কাঠের পরিবর্তে ঘুঁটে পোড়ায় তাহারা এই যজ্ঞের অনুবর্তন করে না। আয়ুর্বেদ গ্রন্থে গোবরের দ্রব্যগুণ বলা হইয়াছে উহা দুর্গন্ধনাশক, কান্তিবর্দ্ধক এবং চুলকানি নাশক। সম্ভবতঃ এই জন্যই পুরাকালে গোবর গায়ে মাখিয়া স্নান করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ইহা অতিশয় বিপজ্জনক। আর আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অন্যান্য জন্তুর মলও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়—সে-সবকে পবিত্র বস্তু বলিয়া গণ্য করা হয় না। * কবিরাজেরা প্রয়োজন হইলে বিধান মত ঔষধরূপে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় গোবর ও গোমূত্রের ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইহাদের একমাত্র ব্যবহার হইতেছে জমীর সাররূপে প্রাকৃত যজ্ঞের অনুবর্তন করা।

এই দিক দিয়া দেখিলে মানুষের মলমূত্রও সাররূপে জমীতে না দিয়া অন্যভাবে নষ্ট হইতে দেওয়া হইতেছে অতিশয় গর্হিত কার্য্য। আমাদের দেশে জমীর স্বাভাবিক উর্বরতা অতিশয় হ্রাস পাইয়াছে, অন্যপক্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন। জমীতে ভাল সার দেওয়া হয় না বলিয়া আমাদের দেশে উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টিকরতা কম হইতেছে এবং সেজন্য লোকে নানা রোগগ্রস্ত হইতেছে, ইহা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মানুষের মলমূত্রকে অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিয়া এবং নদী বা সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিয়া প্রাকৃত যজ্ঞচক্রের যে অপলাপ করা হইয়াছে, বর্তমান দুরবস্থা হইতেছে সেই পাপের ফল। মানুষ অন্যান্য সকল জন্তু অপেক্ষা অধিক খাদ্যদ্রব্য

* মানুষের মূত্র লইয়া সর্পাঘাতের এবং অন্যান্য রোগেরও ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।

জমী হইতে গ্রহণ করে অথচ তাহার মলমূত্র সাররূপে জমীতে ফিরাইয়া দিতেছে না। আমাদের প্রতিবেশী চীনারা এই অন্যায় করে না তাই জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক লোকসংখ্যাকে পোষণ করিয়াও সে দেশের জমীর উর্বরতা অক্ষুণ্ন আছে। আমরাও যদি অবিলম্বে তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করি তাহা হইলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এ-দেশের দুর্দশার সীমা থাকিবে না। মানুষের মলমূত্রকে সহরের অন্যান্য আবর্জনার সহিত মিশাইয়া উত্তম সার প্রস্তুত করিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে ইহা সম্ভব নহে। সেখানে নর নারী পথে, ঘাটে, এমন কি পানীয় জলের পুষ্করিণীর পাড়ে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া গ্রামের জল হাওয়াকে দূষিত করিতেছে, অন্য পক্ষে চাষের জমীগুলি অতি প্রয়োজনীয় সার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। কৃষকগণ যদি তাহাদের জমীতে ছোট ছোট গর্ত খুঁড়িয়া গর্তের মাটি পাশেই ফেলিয়া রাখেন এবং গ্রামের লোক ঐ গর্তের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাটি চাপা দেয় তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে উহা উত্তম সারে পরিণত হইবে। এ-বিষয়ে বিড়ালজাতির নিকট হইতে মানুষের অনেক কিছু শিখিবার আছে। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এইরূপ প্রথা অবলম্বন করা, পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত প্রয়োজন। শুধু স্বাস্থ্যের দিক দিয়া নহে, ধর্মের দিক দিয়াও ইহা অবশ্য কর্তব্য। গীতা বলিয়াছে পবিত্র স্থানে আসন পাতিয়া যোগ সাধনা করিতে হইবে। কিন্তু এক হিসাবে আমাদের সমস্ত জীবনই হইতেছে যোগ, আমরা যাহা খাই, যাহা করি সবকে সকল সময়ে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পণ করাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম (গীতা ৯।২৭)। আমরা যে স্থানে বাস করি, কর্ম করি—সে স্থানকে শুদ্ধ, পবিত্র, সৌন্দর্য্যময় করিয়া রাখিলে আমাদের মন প্রসন্ন থাকে এবং তাহাতে ধর্ম কর্ম সবই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

স্থিরমাসনমাত্মনঃ। পাতঞ্জল যোগসূত্রে বলা হইয়াছে, স্থিরসুখমাসনম্ (২।৪৬), নিশ্চল ও সুখকর আসন অর্থাৎ স্থিরভাবে অধিক কাল থাকিলে যাহাতে কষ্ট বোধ হয় না তাহাকে আসন বলে। তাদৃশ আসনই যোগের অঙ্গ। যোগপ্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থে আসনের বিশেষ বিবরণ আছে। যোগ-ভাষ্যে কয়েকপ্রকার আসনের উল্লেখ করা হইয়াছে। বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ এবং দক্ষিণ উরুর উপর বাম পদ রাখিয়া পৃষ্ঠবংশকে সরল ভাবে রাখিয়া উপবেশনই পদ্মাসন। বীরাসন অর্দ্ধেক পদ্মাসন—তাহাতে এক চরণ উরুর উপরে থাকে আর এক চরণ অন্য উরুর নীচে থাকে।

পাদতলদ্বয় বৃষণ অর্থাৎ কোষদ্বয়ের সমীপে সম্পুট (যোড়) করিয়া তাহার উপর করকচ্ছপিকা (কচ্ছপের আকারে করদ্বয়) স্থাপন করিলে ভদ্রাসন হয়। স্বস্তিক আসনে এক এক পায়ের পাতা অন্যদিকের উরু ও জানুর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া সরলভাবে উপবেশন করিতে হয়। দণ্ডাসনে পা মেলিয়া বসিয়া পায়ের গোড়ালি ও অঙ্গুলি যুড়িয়া রাখিতে হয়। আশ্রয় করিয়া উপবেশনের নাম সোপাশ্রয়। যোগপট্টক অর্থাৎ "চৌগান" নামে বিখ্যাত কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্রবিশেষ কক্ষে স্থাপন করিয়া উদাসীনগণ উপবেশন করিয়া থাকেন। পৃষ্ঠ ও জানুবেষ্টনকারী বলয়াকৃতি দৃঢ় বস্ত্রকেও যোগপট্টক বলা হয়। জানু ও বাহু প্রসারণ করিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করার নাম পর্য্যঙ্কাসন, ইহাকে শবাসনও বলে। আসন কত প্রকার হইতে পারে তাহার সংখ্যা নাই, জগতের এক একটি ক্রিয়া দেখিয়া এক একটি আসনের সৃষ্টি হইয়াছে, ক্রৌঞ্চ, হস্তী ও উষ্ট্রের উপবেশন দর্শন করিয়া যথাক্রমে ক্রৌঞ্চনিষদন, হস্তি-নিষদন ও উষ্ট্রনিষদন অবগত হইতে হয়। শিব সংহিতা, ঘেরণ্ড সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে আসনের বিশেষ বিবরণ আছে। গুরুর উপদেশ ব্যতীত নিজে নিজে আসন শিক্ষা হয় না, তাহাতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে, অতি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। আসন সমুদায় শিক্ষা করিবার সময় কষ্টকর বোধ হয়, একবার সুন্দররূপে অভ্যস্ত হইলে আর কষ্ট হয় না।

গীতা উল্লিখিত কোন আসনেরই নির্দ্দেশ দেয় নাই। আসন দুই-প্রকার, বাহ্য ও শারীর; চেল, অজিন ও কুশ প্রভৃতি বাহ্য আসন, পদ্ম, স্বস্তিক প্রভৃতি শারীর আসন। গীতা এখানে আসন বলিতে বাহ্য আসনই বুঝিয়াছে। তবে সকল প্রকার শারীর আসনের যে সাধারণ লক্ষণ পৃষ্ঠবংশকে সরল রাখা এবং স্থির হইয়া থাকা গীতা তাহারই নির্দ্দেশ দিয়াছে। যেভাবে অধিককাল থাকিলেও কোনরূপ কষ্ট হয় না, তাহাই যোগের উপযুক্ত আসন।

যোগসূত্রে বলা হইয়াছে যে "প্রযত্নশৈথিল্য" দ্বারা আসন সিদ্ধ হয় (২।৪৭)। প্রযত্নশৈথিল্য অর্থাৎ মড়ার ন্যায় গাছাড়া ভাব, গা এলাইয়া দেওয়া, ইংরাজীতে যাহাকে বলা যায় Relaxation, অঙ্গ-সকলকে খেঁচিয়া আসন করা ঠিক নহে। আসন করিয়া গা (হাত পা) ছাড়িয়া দিবে অথচ শরীর কিছু বক্র না হয়। এইরূপ করিলে শরীরের সম্যক স্থিরতা ও সুখবহতা হয়, পীড়াবোধ হ্রাস হয় এবং এইভাবে আসন জয় হইলে শীত-উষ্ণাদি দ্বন্দ্বের দ্বারা সাধক অভিভূত হয় না, ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ (২।৪৮)। এমন যোগী দেখা যায়, প্রচণ্ড শীত, প্রখর গ্রীষ্ম অথবা বিষম বর্ষা কিছুতেই

তাঁহার দৃক্‌পাত নাই, স্থিরভাবে সদানন্দরূপে নিজ কার্য্য করিতেছেন। এইরূপ আসন সিদ্ধি হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদরূপ প্রাণায়ামও সিদ্ধ হয় (২।৪৯)।

চেলাজিনকুশোত্তরম্। গীতা যে বাহ্য আসনের বিধান দিয়াছে, প্রথমে কুশাসন, তদুপরি অজিন, তাহার উপর কোমল রেশমী বস্ত্র—ইহা সার্বভৌম অহিংসার অনুকূল নহে। অজিন শব্দে মৃগচর্ম বা ব্যাঘ্রচর্ম বুঝায়—সাধারণতঃ এইসব পশুকে বধ করিয়াই এইরূপ চর্ম লাভ করা যায়। আর চেল শব্দের অর্থ রেশমী বস্ত্র, গুটিপোকাকে নিহত করিয়াই ঐরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়—অথচ প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ বস্ত্র শুদ্ধ বলিয়াই পরিগণিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পাতঞ্জল যোগসূত্রে অহিংসার যে বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহা এই সব বস্তু ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী। সাধনপাদ ৩৪ সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—হিংসা কৃত, কারিত ও অনুমোদিত এই ত্রিবিধ। স্বয়ং প্রাণীকে বধ করা কৃত হিংসা। মাংস চর্মাদি ক্রয় করা কারিত হিংসা। কেহ কোন প্রাণী বধ করিলে তাহা অনুমোদন করা, যেমন "সাপ মারিয়াছ, উত্তম করিয়াছ" ইত্যাকার অনুমোদন। এই তিনের মধ্যে এক একটি আবার ত্রিবিধ। লোভপূর্বক যেমন মাংসচর্মের নিমিত্ত; ক্রোধপূর্বক যেমন, "এ আমার অপকার করিয়াছে, অতএব হিংস্য"; এবং মোহপূর্বক যেমন "যজ্ঞে পশুবলি হইতে আমার ধর্ম হইবে," "ভগবান পশু-দেরকে মারিয়া খাইবার জন্য সৃজন করিয়াছেন," ইত্যাদি মোহযুক্ত সিদ্ধান্ত। এইরূপ সকল প্রকার হিংসা অনন্ত দুঃখ ও অনন্ত অজ্ঞানের কারণ বলিয়া সর্বথা পরিত্যাজ্য। পাতঞ্জল দর্শনে এইভাবে অহিংসাকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা সাংখ্যদর্শনেরও মত। পাতঞ্জল মতে সত্য প্রভৃতি যম এবং শৌচাদি নিয়ম সমস্তই অহিংসামূলক অর্থাৎ তাহারা অহিংসা সিদ্ধির হেতু বলিয়া অহিংসা প্রতিপাদনের নিমিত্তই শাস্ত্রে প্রতি-পাদিত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের মতে আধ্যাত্মিক উন্নতির অভিলাষ থাকিলে অহিংসাকে সার্বভৌম ব্রত রূপে পালন করিতে হইবে অর্থাৎ কোনও প্রকারে, কোনও কালে, কোনরূপে প্রাণীর অভিদ্রোহ বা প্রাণবিয়োগ করা চলিবে না। অহিংসা সিদ্ধি হইয়াছে কি না তাহার প্রমাণ পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে, অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ (২।৩৫) —"অহিংসাবৃত্তি সম্যকরূপে স্থির হইলে তাদৃশ যোগীর নিকট অপর সমুদয় হিংস্রক জন্তুর হিংসাবৃত্তি থাকে না।" এই অহিংসা বৃত্তির উৎকর্ষ বিধান করিবার নিমিত্তই সাংখ্যশাস্ত্রকর্তা বৈধহিংসাকেও (যজ্ঞে বলিদান) পাপের

কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু জীবন ধারণ করিলে প্রাণীবধ অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে অহিংসা সাধন কেমন করিয়া সম্ভব হয়? উদ্ভিদের মধ্যেও প্রাণ আছে, অতএব নিরামিষ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিলেও প্রাণীহিংসা করা হয়। আর সাধারণ সংসারী লোককে আত্ম-রক্ষার জন্য আতাতায়ী বধ, সর্পাদি অপকারী জন্তু বধ প্রভৃতি হিংসা করিতেই হয়। যাহারা যোগী সন্ন্যাসী তাঁহাদের অহিংসা সাধনের সুযোগ গৃহস্থ অপেক্ষা অধিক। আর তাহাদের পক্ষেও যে হিংসা অপরিহার্য্য তাহাতে তাঁহাদের সার্বভৌম ব্রত ভঙ্গ হয় না এই জন্য যে তাঁহারা সকল হিংসার মূল এই যে দেহধারণ তাহা যেন আর কখনও না হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া যোগসাধনা করেন। কপিলাশ্রমীয় যোগদর্শনে এ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"যোগীদের পক্ষে অহিংসাদির সার্বভৌম মহাব্রত আচরণীয় তাই তাঁহারা অহিংসাদি যতদূর সম্ভব আচরণের চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ তাঁহারা মনুষ্যজাতির এমন কি আততায়ীরও হিংসা করেন না এবং পশুদের প্রতিও যথাসম্ভব অহিংসা বা অতিমৃদু হিংসা (যেমন সাপাদিকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেওয়া মাত্র) করেন। দ্বিতীয়তঃ অকারণে স্থাবর প্রাণীদেরও (বৃক্ষলতাদি) উৎপীড়িত করেন না। দেহধারণের জন্য কেহ কেহ শীর্ণ-পর্ণাদি ভোজন করেন অথবা ভিক্ষান্নে দেহধারণ করেন। পুরাকালে নিয়ম ছিল (এখনও আর্য্যাবর্তের অনেক স্থানে আছে) যে, গৃহস্থ কিছু বেশী অন্ন পাক করিবে এবং তাহার কিয়দংশ সমাগত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের দিবে। 'সন্ন্যাসীব্রহ্মচারী চ পক্কান্নস্বামিনাবুভৌ।' সন্ন্যাসী যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে করিতে কোন গৃহস্থের বাড়ী মধুকরী লইলে তাঁহার তাহাতে অনুঘটিত হিংসাদোষ হয় না। মনু আরও বলেন, পাদক্ষেপাদিতে যে অবশ্যম্ভাবী হিংসা হয় সন্ন্যাসী তাহা ক্ষালনের জন্য অন্তত ১২ বার প্রাণায়াম করিবেন। এইরূপে যোগীরা মৃদুতম অবশ্যম্ভাবী হিংসা করিয়াও অহিংসাধর্মকে প্রবর্তিত করত শেষে যোগসিদ্ধির দ্বারা দেহধারণ হইতে শাশ্বতকালের জন্য বিমুক্ত হইয়া সর্বপ্রাণীর অহিংসক হন। দেশকাল ও আচার ভেদে প্রাচীনকালের সুযোগ না পাইলেও অহিংসার এই তত্ত্বসকল লক্ষ্য করত যথাশক্তি অহিংসার আচরণ করিয়া গেলে হৃদয় হিংসাদোষ মুক্ত হয় ও তাহাতে যোগ অনুকূল হয়। অবশ্যম্ভাবী কিছু হিংসা অত্যাজ্য হইলেও আমি যোগের দ্বারা অনন্তকালের জন্য সর্বপ্রাণীর অহিংসক হইতে পারিব' এই বিশুদ্ধ অহিংসা-সঙ্কল্পের দ্বারা সেই দোষ বারিত হয়। কারণ হৃদয়শুদ্ধিই যোগসাধনের উদ্দেশ্য"।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই রাজযোগ গৃহস্থের পক্ষে উপযোগী নহে, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরাই ইহার সাধনা করিতে পারেন। কিন্তু গীতার সাধনা সন্ন্যাসীদের জন্য নহে, গৃহস্থের জন্য, সংসারী ব্যক্তির জন্য। বর্তমানে মানুষ যে-ভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, ইহা দুঃখ ও অশান্তিতে পূর্ণ, জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-বিভীষিকাময়। এই সংসারে থাকিয়াই সকল দুঃখদ্বন্দ্বের অতীত হইয়া অমৃতত্ব উপভোগ করিতে হইলে যে সাধনা করিতে হয়, অন্তর্মুখী হইয়া আত্মাকে জানিতে হয়, আত্মার চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়, এবং সেই আভ্যন্তর প্রতিষ্ঠা হইতে বাহিরের জীবনকেও উন্নত, রূপান্তরিত, অধ্যাত্মভাবাপন্ন করিতে হয় গীতা তাহারই নির্দ্দেশ দিয়াছে—তাই গীতা পতঞ্জলির রাজযোগ সমগ্রভাবে গ্রহণ করে নাই—উহার মধ্যে সার যেটুকু তাহাই লইয়াছে। সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম করিতে করিতেও যে যোগসাধনা করা যায়, অধ্যাত্মজীবন লাভ করা যায়, যুদ্ধের ন্যায় ঘোর হিংসাত্মক কর্মে অর্জুনকে প্রবৃত্ত করাইয়া গীতা সেই শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু পাতঞ্জল যোগে অহিংসাদি যমসকল সার্বভৌম ব্রতরূপে পালন করিতে হয়,

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্ ।২।৩১

"তাহারা (যমসকল) দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইলে সার্বভৌম মহাব্রত হয়।" 'সময়' অর্থে কর্তব্যের নিয়ম। যেমন অর্জুন ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য বলিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা সময়বশে হিংসা। পাতঞ্জল যোগাভ্যাসকারীদের পক্ষে সর্বথা ও সর্বত্র হিংসা বর্জনীয়।

কিন্তু বৈদিক যুগে এইরূপ সার্বভৌম অহিংসার আদর্শ প্রচারিত হয় নাই। তখন যজ্ঞে পশু বলি দেওয়া হইত। গোমাংস পর্য্যন্ত বৈদিক আর্য্যগণের আহার্য্য ছিল। বৈদিক ঋষিগণ এই দেহকে পাপের মূল বলিয়া যথাশীঘ্র ত্যাগ করিবার আদর্শ প্রচার করেন নাই, তাঁহারা এই পার্থিব মানবজীবনকে পূর্ণতম, সমৃদ্ধতম করিতে চাহিয়াছিলেন—ইহার জন্য জীবহিংসা প্রয়োজনীয় হইলে তাঁহারা তাহাতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কালক্রমে বৈদিক ধর্মে গ্লানি উপস্থিত হয়। লোকে বেদের ভিতরের অর্থ না বুঝিয়া ক্রিয়াবিশেষবহুলাং বাহ্য অনুষ্ঠানে আসক্ত হইয়া পড়ে, যজ্ঞের নামে, ধর্মের নামে জীবহিংসাও বৃদ্ধি পায়। এই সব অনাচারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন গৌতমবুদ্ধ এবং তিনি যে সার্বভৌম অহিংসার বাণী, জীবে দয়ার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই প্রভাব পাতঞ্জল যোগসূত্রের ন্যায় হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা

ভারতবাসীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় হিন্দুগণ যেমন জীবহিংসা করিতে কুণ্ঠিত এমনটি জগতের আর কোন জাতি, কোন ধর্মে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার দ্বারা তাহাদের হৃদয়ের কোমল-বৃত্তির বিকাশ এবং নৈতিক উন্নতিতে সহায়তা হইয়াছে, উচ্চতর মানবতার জন্য তাহাদের হৃদয় প্রস্তুত হইয়াছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্যদিকে এই অহিংসাধর্মেরই অতিমাত্রায় জীবন-যাত্রায় তাহারা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। এ জগতে প্রাণীবধ না করিয়া কেহ ক্ষণকালের জন্যও জীবনধারণ করিতে পারে না। প্রতি নিঃশ্বাসে কত জীব নষ্ট হইতেছে। যাহারা জীব হিংসা করিতে কুণ্ঠিত তাহারা একটা গোক্ষুরা সাপ দেখিলেও মারিতে চাহে না—ইহা জীবন ধারণের পক্ষে কিরূপ বিপজ্জনক তাহা বলাই বাহুল্য। আর যাহারা সাপ পর্য্যন্ত মারিতে কুণ্ঠিত, তাহারা যুদ্ধ করিতে, শত্রু সংহার করিতে উৎসাহ পাইবে কোথা হইতে? ফলে অহিংসাধর্মের প্রচারে ভারতে ক্ষত্রিয়ধর্মের হানি হয়, তাহারই ফল হইয়াছে ভারতের সুদীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতা। গীতা এই বিপদ আশঙ্কা করিয়াই সার্বভৌম অহিংসাধর্মের প্রতিবাদ করিয়াছে। অর্জুন অহিংসা আদর্শের প্রভাবে ক্ষত্রিয়ধর্মপালনে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, আততায়ীকে পর্য্যন্ত বধ করিতে চাহেন নাই, বলিয়াছিলেন ইহাতে যে তাঁহার পাপ হইবে,

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই ভাবকে দুর্বলতা ও মোহ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। গীতাও অহিংসার উপদেশ দিয়াছে, অহিংসাকে শারীরিক তপস্যা এবং দৈবী সম্পদ বলিয়াছে—কিন্তু যাহাতে মানবজীবনের সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা বিকাশে সহায়তা হয় এমন হিংসাকে গীতা হিংসা বলিয়া গণ্য করে নাই। বস্তুতঃ পাপ পুণ্য কোন চরম সত্য নহে। এ জগতে প্রাণীই প্রাণীর খাদ্য—প্রকৃতি যেমন অনবরত সৃষ্টি করিতেছে তেমনই অনবরত ধ্বংস করিতেছে, আবার সেই ধ্বংস হইতেই নূতন সৃষ্টি হইতেছে—ইহাই জগৎচক্র, বিশ্বযজ্ঞ, বৈদিক যজ্ঞে পশু বলিদান ছিল ইহারই প্রতীক স্বরূপ—যাহারা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়াছে, নিজেদের কর্মকে প্রকৃতির কর্ম বলিয়াই অনুভব করে, আত্মাকে সাক্ষী ও অকর্তা বলিয়া জানে, তাহাদের কোন কর্মেই পাপ হয় না—প্রকৃতি লক্ষ লক্ষ প্রাণী বধ করিয়াও যেমন পাপে লিপ্ত হয় না, তাহারাও তেমনিই প্রাণীবধ এমন-কি নরহত্যা করিলেও পাপ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না—

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ।। ১৮।১৭

গীতা বিশ্বরূপে দেখাইয়াছে যে, ভগবান নিজেই সংহারকর্তা—তিনি বিশ্বের সকল প্রাণীকে চর্বণ করিতেছেন! অর্জুন অহিংসাধর্মের প্রভাবে যুদ্ধে নর-হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন—ভগবানের এই বিশ্বরূপ দেখিয়া তিনি জগতের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইলেন, তাঁহার সকল কুণ্ঠা দূর হইল। চিরকাল মানুষকে যুদ্ধ করিতে হইবে, জগৎ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া যাইয়া মানবসমাজে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না—ইহা গীতার শিক্ষা নহে। গীতা মানুষকে হিংসাভাবশূন্য হইতেই শিক্ষা দিয়াছে—হৃদয় হইতে হিংসাভাব দূর হইলেই বাহিরে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হইবে, তাহার পূর্বে নহে। যতদিন মানবের হৃদয় এই ভাবে শুদ্ধ না হইতেছে ততদিন মানব-সমাজে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং ততদিন আত্মরক্ষার জন্য যাহারা যুদ্ধ না করিবে তাহারা ধ্বংস হইবে। সাধ্য থাকিতে দুর্বল ও আর্তকে আততায়ীর হাত হইতে রক্ষা করিতে যাহারা যুদ্ধ না করিবে তাহাদের সেই অহিংসার ফলে জাতি ও সমাজ ধ্বংস হইবে, অতএব পরোক্ষভাবে তাহারাই সেই হিংসার জন্য দায়ী হইবে। নিজহস্তে হিংসা না করিলেই যে হিংসা হইবে না, এমন কোন কথা নাই। অতএব যখন হিংসা এড়ান সম্ভব নহে, তখন অহিংসাকে সার্বভৌম ব্রত হিসাবে গ্রহণ করা কর্তব্য নহে—ইহাই গীতার শিক্ষা। একটা পোকা মাকড়কেও মারিব না, এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হইলে মন প্রাণ ইন্দ্রিয় এমনভাবে অহিংসায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে যে প্রয়োজন হইলে একটা সাপকেও আমরা মারিতে পারিব না, আততায়ীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইয়া আমরা জগতে অনাচার ও অত্যাচারকেই প্রশ্রয় দিব *—তাহাতে আমাদের সার্বভৌম অহিংসাধর্মও পালন করা হইবে না। অতএব অহিংসা ধর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিতে হইবে।

বস্তুতঃ কোন কর্মই পাপ বা পুণ্য নহে, ভিতরে কি মনোভাব লইয়া কর্ম করা যায় তাহার উপরেই পাপ পুণ্য নির্ভর করে। মানুষ যতদিন অজ্ঞান অহংভাবের মধ্যে বাস করিতেছে ততদিনই তাহার পাপ-বোধের সার্থকতা আছে, জ্ঞানী ব্যক্তির পাপও নাই পুণ্যও নাই, জহাতি উভে সুকৃতদুষ্কৃতে; তাহাই পাপ যাহা মানুষের ঊর্দ্ধ বিকাশে বিঘ্ন হয়, তাহাই পুণ্য যাহা তাহাতে সহায় হয়। যে ঊর্দ্ধের চৈতন্যে, অধ্যাত্ম চৈতন্যে সু-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার আর উপরে উঠিবার জন্য পুণ্যের প্রয়োজন হয়

* এই জন্যই বন্য পশু শিকার করা ক্ষত্রিয়গণের শিক্ষার অঙ্গ ছিল।

না, অথবা পাপের দ্বারা পড়িয়া যাইবার কোনও ভয় থাকে না। তাহারা কর্ম করেন শুধু জগতে ভগবানের ইচ্ছা পূরণের জন্য, ভগবানের যেমন কোন কর্মেই পাপ বা পূণ্য হয় না, তাঁহাদেরও তেমনই পাপ বা পুণ্য নাই।

কিন্তু যতক্ষণ এই উচ্চ অধ্যাত্ম অবস্থা লাভ না হইতেছে ততক্ষণ এমন কোন কর্ম করা উচিত নহে যাহাতে আমাদের ঊর্দ্ধ বিকাশে বাধা হয়। আমাদের মধ্যে রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়াকে সত্ত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াই আমরা উপরের দিকে উঠি। অতএব কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির বশে কোন কর্ম না করিয়া সর্বত্র বুদ্ধি বিচারের দ্বারা কর্ম করিলেই সেইটি হয় আমাদের সহায় অতএব পূণ্য, এবং ইহার ব্যতিক্রম হইলেই হয় পাপ। লোভের বশে বা ক্রোধের বশে জীবহিংসা করিলে তাহাতে আমাদের মধ্যে নীচ রাজসিক বৃত্তিগুলি প্রশ্রয় পায় সেই জন্য ঐরূপ হিংসা বর্জনীয়। কিন্তু মানবজীবনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যদি প্রাণীবধ করা যায় তাহাতে কোন পাপ হয় না। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে আমিষ ভক্ষণ না করিলে জীবন রক্ষা হয় না। যাঁহারা নিরামিষ ভক্ষণ করেন, সুস্থ ও সবল থাকিতে হইলে তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ ও ফল মূল আহার প্রয়োজন। কিন্তু সকলের পক্ষে এই সব খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব নহে—অতএব সার্বভৌম অহিংসাধর্মের প্রচার করিলে মানব-জাতির হিংসা করা হয়। মানুষের ভিতর দিয়াই জগতে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে,

কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার সহায়।

* * *

শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

এই যে মানবজীবনে ভগবানের লীলা পূর্ণ হইতেছে ইহাকে সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ করিতে যে কাজই করা যায় তাহাতে ভগবানের ইচ্ছাই পূরণ করা হয় অতএব তাহাতে পাপ হয় না। বস্তুতঃ ক্রূরতা, জিঘাংসা, দ্বেষ আদি দূষিত মনোভাব হইতে যে প্রাণীবধ বা প্রাণীকে উৎপীড়ন করা হয় তাহাই হিংসা এবং তাহা পরিত্যজ্য কারণ তাহাতে মানুষের হৃদয় কঠোর হইয়া উঠে এবং তাহার নৈতিক অবনতি হয়। এমন মানুষ আছে যাহারা রক্তপাত

করিয়া বা পরকে পীড়ন করিয়া আনন্দ অনুভব করে—ইহা হইতেছে আসুরিক বিকার এবং ইহাই প্রকৃত হিংসা। আহারের জন্য বা আত্মরক্ষার জন্য বা মানবজীবনের কোন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রাণীবধ করিলে তাহাতে পাপ হয় না। রামকৃষ্ণ বলিতেন, "পান খাওয়া, মাছ খাওয়া, তামাক খাওয়া, তেল মাখা এ-সবতাতে দোষ নাই। এ-সব শুধু ত্যাগ করলে কি হবে? কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই দরকার। সেই ত্যাগই ত্যাগ।" মনুও বলিয়াছেন, মাংসাদি ভক্ষণে দোষ নাই কারণ উহা প্রাণীদের প্রবৃত্তি, কিন্তু ইহা হইতে নিবৃত্তি হইলে মহাফল। মূল কথা হইতেছে, ভিতরটাকে শুদ্ধ করা, সর্বভূতের প্রতি মৈত্রী ও করুণার ভাব পোষণ করা। বাহ্য কোন্ কর্ম করা হইবে, না করা হইবে, তাহা দ্বেষ হিংসাদির দ্বারা ঠিক না করিয়া প্রথমে শাস্ত্র অনুসারে নির্ণয় করিতে হইবে, পরে সাক্ষাৎ ভাবে ভগবদিচ্ছার দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। হৃদয়কে শুদ্ধ করিবার জন্য অহিংসার সাধন খুবই প্রয়োজনীয় এবং সে সাধনা হইতেছে যথাশক্তি অনাবশ্যক স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের হিংসা হইতে বিরত থাকা এবং প্রাণীদের মধ্যে যথাশক্তি উচ্চ প্রাণীদের দুঃখ দান না করা। উচ্চ প্রাণীদের যন্ত্রণা বোধের যে সামর্থ্য আছে ক্ষুদ্র কীটের তাহা নাই—অতএব প্রয়োজন মত জীবাণু বা কীট বধ করিতে কোন কুণ্ঠা বোধ করিবার প্রয়োজন নাই।

বৌদ্ধধর্মে, জৈনধর্মে, পাতঞ্জলদর্শনে যে সার্বভৌম অহিংসার বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহার কারণ তাহারা এই দেহের জীবনটাকেই একটা পাপ বলিয়া মনে করেন, এবং যতশীঘ্র সম্ভব এই দেহ হইতে মুক্ত হইয়া আর কখনও যেন এই পাপজীবনের মধ্যে আসিতে না হয় তাহাই হইতেছে তাহাদের সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু বেদে এই পৃথিবীর দৈহিক জীবনকে পাপ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই; এই মর্ত্য জীবনকেই অমৃতত্বে পরিণত করিবার কথা বলা হইয়াছে। দেহের জীবনকে সুবিকশিত করিবার জন্য কতক পরিমাণে প্রাণীবধ অপরিহার্য্য, তাই বেদে সার্বভৌম অহিংসাধর্ম প্রচার করা হয় নাই। গীতা এই আদর্শই পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়াছে, এবং জীবন ধারণ ও বিকাশের জন্য প্রাণীবধ অপরিহার্য্য জানিয়া যাহাতে সেরূপ হিংসায় প্রকৃত হিংসা না হয়, পাপ না হয়, সেই অধ্যাত্ম সাধনারই নির্দেশ দিয়াছে।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা।—পবিত্র স্থানে স্থির সুখকর আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। কি করিয়া যোগ অভ্যাস করিতে হইবে সেই সম্বন্ধেই বলা হইতেছে যে মনকে একাগ্র করিতে হইবে। সাধারণতঃ মানুষের চিত্ত বা মন

হইতেছে অত্যন্ত অস্থির, তাহার মধ্যে অনবরত নানা বিষয়ের, নানা ভাবের চিন্তা উঠিতেছে। সেরূপ চিত্তের পক্ষে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব-সকলের ধারণা করা সম্ভব হয় না, যোগের লক্ষ্য যে আত্মার জ্ঞান, আত্মার উপলব্ধি, ঐরূপ মনের নিকট তাহা অচিন্ত্য বোধ হয়। যোগশাস্ত্রে এইরূপ চিত্তকে ক্ষিপ্তভূমিক বলা হয়। চিত্ত বা মনকে কেমন করিয়া একাগ্র করিতে হয় তাহাই প্রকৃত রাজযোগের সাধনা। চিত্ত একাগ্র হইলে সেই চিত্তকে একাগ্রভূমিক বলা হয়—এইরূপ ভূমিতেই সাধক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া ক্রমে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা কৈবল্যের জন্য প্রস্তুত হয়। এইরূপ কৈবল্য অর্থাৎ চিত্তের সম্যক লয় এবং পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতি গীতার লক্ষ্য নহে—চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া প্রকৃতিতে ভগবানের সাধর্ম্যলাভ করাই গীতোক্ত সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু সেই চিত্তশুদ্ধির জন্যও চিত্তের একাগ্রতা সাধন প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যেই গীতা এখানে রাজযোগের দ্বারা কেমন করিয়া চিত্তকে একাগ্র করা যায় তাহাই বর্ণনা করিতেছে। "এক অগ্র বা অবলম্বন যে চিত্তের তাহা একাগ্র চিত্ত। সূত্রকার বলিয়াছেন, শান্তাদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ অর্থাৎ একবৃত্তি নিবৃত্তি হইলে যদি তাহার পরে ঠিক তদনুরূপ বৃত্তি উঠে এবং তাদৃশ অনুরূপ বৃত্তির প্রবাহ চলিতে থাকে, তবে তাদৃশ চিত্তকে একাগ্র চিত্ত বলে। ঐরূপ ঐকাগ্র্য যখন চিত্তের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়, যখন অহোরাত্রের অধিকাংশ সময় চিত্ত একাগ্র থাকে, এমন কি স্বপ্নাবস্থাতেও একাগ্র স্বপ্ন হয়, তখন তাদৃশ চিত্তকে একাগ্রভূমিক বলা যায়।" (কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন)

কোনরূপ যোগসাধনা না করিয়াও স্বভাবতঃ চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারে এবং একাগ্রতার যে ফল দুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দ তাহাও লব্ধ হইতে পারে। মানুষের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইলে আপনা হইতেই এইরূপ একাগ্রতা আইসে—প্রেমাস্পদের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা তখন মনে স্থান পায় না, প্রিয়কে দেখিয়া, প্রিয়ের কথা শুনিয়া, প্রিয়কে চিন্তা করিয়া, প্রিয়ের মিলন লাভ করিয়া মানুষ যে আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে তাহাতে সংসারের সকল দুঃখ, সকল বিক্ষোভ তুচ্ছ হইয়া যায়। বিল্বমঙ্গলের কাহিনী এইরূপ একাগ্রতার সুন্দর দৃষ্টান্ত। নদীতে প্রবল বন্যা, পারাপারের কোন উপায় নাই, কিন্তু প্রিয়ার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল যে বিল্বমঙ্গল প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া সেই খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল—সাঁতার দিয়া পার হইবে! হস্ত পদ স্রোতের বেগে অবশ হইয়া আসিল—ঠিক সেই সময় একটা মড়া ভাসিয়া যাইতেছিল, বিল্বমঙ্গল সেইটি অবলম্বন করিয়া ভাবিতে লাগিল—"আহা! আমার জন্য প্রিয়ার কত ভাবনা!

এই সুন্দর কাঠ সে ভাসাইয়া দিয়াছে যেন এইটি ধরিয়া শীঘ্র আমি তাহার কাছে উপস্থিত হইতে পারি"। তীরে উঠিয়া দেখে তাহার প্রিয়ার বাড়ীর দ্বার বন্ধ। উচচ দেওয়াল টপ্‌কাইয়া পার হওয়া যায় না—উদ্‌ভ্রান্ত বিল্বমঙ্গল দেখিল দেওয়ালের পাশেই একটি বৃক্ষ হইতে দড়ির মত কি ঝুলিতেছে! আবার প্রিয়ার গুণের কথা মনে হইল। প্রিয়া তাহার জন্য দড়ি ঝুলাইয়া রাখিয়াছে! প্রেমান্ধ বিল্বমঙ্গল দেখিতে পাইল না, যে-দড়ি ধরিয়া সে উঠিতেছে সেটা বস্তুতঃ দড়ি নহে—এক বিরাট অজগর সাপ। বিল্বমঙ্গলের টানাটানিতে সাপটি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বিল্বমঙ্গল গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলে তাহার প্রিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন করে তুমি এই ভীষণ নদী পার হয়ে এলে?"

"কেন, প্রিয়া, তুমি যে আমার জন্য কাঠ ভাসিয়ে দিয়েছিলে, দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছিলে।" প্রিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "কই দেখি কেমন কাঠ, কেমন দড়ি।" মৃত সর্প এবং সেই মৃত দেহ দেখিয়া প্রিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। তখন সে বলিল—"আমি একটা সামান্য বেশ্যা, যে-মন তুমি আমাকে দিয়েছ সেই মন যদি ভগবানকে দিতে ত তোমার কাজ হত।"

ঐ একটি কথাতেই বিল্বমঙ্গলের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল—একাগ্রতার সাধনায় তাহার চিত্তের সমস্ত মল দূর হইয়া গিয়াছিল, বেশ্যার মুখ হইতে বীজমন্ত্রের মত ঐ কথা কয়টি শুনিবা মাত্র সে উপলব্ধি করিল—এ জগতে একমাত্র ভগবানই সত্য, এতদিন ঐ বেশ্যার মধ্যে সেই ভগবানকেই তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের হৃদয়ের মধ্যেও সেই ভগবান, সর্বভূতের মধ্যে সেই এক ভগবান—এই সমগ্র জগৎ হইতেছে প্রেমের, সৌন্দর্য্যের, আনন্দের, লীলা।

পূর্বজন্মের সাধনার ফলে বিল্বমঙ্গলের চিত্ত অনেকখানি শুদ্ধ ও প্রস্তুত হইয়াছিল—তাই তাহার মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেমের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের যে-প্রেম তাহা নানা আবিলতায় পূর্ণ, তাহা স্থায়ী হয় না, তাহার দ্বারা একাগ্রতা সাধনের আশা খুবই কম। তাই চিত্তের একাগ্রতা সাধনের জন্য নানা প্রকার যোগ-প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে। আমাদের মন সাধারণতঃ নানা চিন্তায় বিক্ষুব্ধ; ধ্যান অভ্যাসের দ্বারা তাহাকে একাগ্র করা যায়। সাধারণ জীবনেও মানুষ চিন্তায় ও কর্মে একাগ্র হয়। কোন সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, কোন কর্ম সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে—মানুষ স্বভাবতঃই একাগ্র হয়। যোগীরা এই একাগ্রতার প্রাকৃত নিয়মগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তাঁহারাও

চিত্তের মনের প্রাকৃত নিয়ম অনুসরণ করেন, তবে বৈজ্ঞানিক যেমন বাহ্য প্রকৃতির কর্মের ধারা আবিষ্কার করিয়া সেগুলিকে ব্যবহারিক জীবনের কাজে লাগান, যোগীরাও সেইরূপ মানুষের আভ্যন্তরীণ ধারা-সকলের জ্ঞান লাভ করিয়া তাহাদিগকে কাজে লাগান। যোগীদের উদ্দেশ্য হইতেছে সাংসারিক দুঃখ হইতে আত্যন্তিক নিবৃত্তি, আত্মজ্ঞান লাভ, ভগবানের সহিত সজ্ঞানে যুক্ত হওয়া। ইহার জন্য যোগীরা চিত্তের একাগ্রতা সাধনের নানা উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কোন বিশেষ বস্তুতে যদি মনকে একাগ্র করা যায় তাহা হইলে বিশ্বচৈতন্য হইতে একটা সাড়া পাওয়া যায়, এবং তাহার ফলে ঐ ধ্যেয় বস্তু সম্বন্ধে নানা তথ্য এমন-কি উহার নিগূঢ় তত্ত্ব পর্যান্ত জানা যায়। একাগ্রতার দ্বারা বিশ্ব-শক্তিতেও স্পন্দন তোলা যায়, তাহার ফলে আমরা জাগতিক বস্তু ও ঘটনার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারি, তাহাদিগকে ইচ্ছামত চালিত করিতে পারি। আজকাল অজ্ঞানের বশে অনেকে বলিয়া থাকেন, যোগ সাধনা একটা মানসিক ব্যাধি, উহার দ্বারা দেশের বা জগতের কি উপকার সাধিত হইবে? তাঁহারা যোগ কী তাহা বুঝেন না। সাধারণ জীবনে আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ চিন্তাশক্তির, ইচ্ছাশক্তির যে বহুল অপচয় করি, যোগসাধনার দ্বারা তাহা নিবারিত হয়, মানুষের মধ্যে জ্ঞানের, কর্মের, প্রেমের অসাধারণ শক্তি-সকল বিকশিত হয়—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই যে-সব শক্তির সম্ভাবনা মানুষের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে অবহেলা করিয়া, তাহাদিগকে জাগ্রত, বিকশিত করিবার চেষ্টা না করিয়া বর্তমান অতি সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও শক্তি লইয়া আমরা মানবজাতির কতটুকু উন্নতি করিতে পারিব?

তবে যোগসাধনা সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রান্ত বিরুদ্ধ ধারণা যে প্রচলিত হইয়াছে তাহারও কারণ আছে। সে-কারণ হইতেছে এই যে, যোগীরা যোগ-লব্ধ অসাধারণ শক্তিকে প্রায়ই অবহেলা করিয়াছেন—সংসারের নিবৃত্তি করিয়া পরম তত্ত্বে চিরনির্বাণ লাভ করাকেই তাঁহারা যোগসাধনার লক্ষ্য করিয়াছেন, তাই তাঁহাদের দ্বারা জগতের বা মানবজাতির বাহ্যিক বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই। কিন্তু ইহা যোগ সাধনার ত্রুটি নহে, যোগীদের লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণাতেই ত্রুটি। যোগীরা যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করাকেই লক্ষ্য করিয়া-ছেন তাহা লাভ করিতেই হইবে, ব্রহ্ম হইতে হইবে—কিন্তু তাহাই সব নহে, ঐ ব্রহ্ম জ্ঞানের সহায়ে এই পার্থিব মানবজীবনকে রূপান্তরিত করিতে হইবে, মর্ত্যদেহে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রকাশ করিতে হইবে—ইহাই হইতেছে পূর্ণ-যোগের লক্ষ্য, গীতাতে আমরা এইরূপই এক পদ যোগের আভাস পাই।

ধ্যানের লক্ষ্য চিত্তের একাগ্রতা সাধন—ইহা দুই প্রকার হইতে পারে। চিত্তকে অন্যান্য চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়া কোন একটি বিষয় ধারাবাহিক ভাবে, সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করা। যেমন ভগবান সম্বন্ধে চিন্তা, তাঁহার স্বরূপ কী, গুণ কী, কেমন করিয়া তাঁহা হইতে জীব জগৎ উৎপন্ন হইল, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ কী ইত্যাদি। আব একরকম ধ্যান হইতেছে কোন রকম চিন্তা না করিয়া চিত্তকে কোন একটি বস্তু বা ভাবে লাগাইয়া রাখা—কোন মূর্তি, শরীরের কোন অংশ—যথা হৃদয়, মস্তক, কোন সাধুপুরুষের চরিত্র ইত্যাদি। পাতঞ্জলের রাজযোগে দ্বিতীয় প্রকার ধ্যানের উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম প্রকার ধ্যান প্রাথমিক প্রণালীরূপে দ্বিতীয় প্রকার ধ্যানের জন্য চিত্তকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবে। রাজযোগের লক্ষ্য হইতেছে চিত্তকে সকল প্রকার বিক্ষেপ হইতে মুক্ত করা—যে-কোন বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করিলে এই সব বিক্ষেপ দূর হয়, তাই কোন্ বিষয় অবলম্বন কবিতে হইবে সে-সম্বন্ধে বিশেষ কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই।—

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ —১।৩২

তাহার (বিক্ষেপের) নিবৃত্তির জন্য একতত্ত্বাভ্যাস করিবে। এই সূত্রেব টীকায় কপীলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শনে বলা হইয়াছে —"এক তত্ত্ব অর্থে মিশ্র বলেন ঈশ্বর, ভিক্ষু বলেন স্থূলাদি কোন তত্ত্ব, ভোজরাজ বলেন কোন এক অভিমত তত্ত্ব। বস্তুতঃ এখানে ধ্যেয়পদার্থের নির্দেশ বিষয়ে বিবক্ষা নাই, কিন্তু ঈশ্বরাদি যাহাই ধ্যেয় হউক তাহা একতত্ত্বরূপে আলম্বন কবিতে হইবে। ঈশ্বরাদি ধ্যান নানাভাবে ক্রমশঃ করা যাইতে পারে। যেমন স্তোত্র আবৃত্তি পূর্বক তদর্থ চিন্তা করিলে চিত্ত ঈশ্বরবিষয়ক নানা আলম্বনে বিচরণ করিতে থাকে। একতত্ত্বাবলম্বন সেরূপ নহে। ঈশ্বর সম্বন্ধে যখন কোন একই রূপ আধ্যাত্মিক ভাবে বা ধারণায় চিত্তেব স্থিতি হইবে তখন তাদৃশ একরূপ আলম্বনে অবধান করার অভ্যাসই একতত্ত্বাভ্যাস। তাহা বিক্ষেপের বিরোধী সুতরাং তদ্দ্বারা বিক্ষেপ বিদূরিত হয়। অন্যান্য ধ্যেয় সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।"

যে-কোন বিষয় যাহার ভাল লাগে তাহাতেই মন লাগাইয়া ধ্যান অভ্যাস করিলে একাগ্রতা লাভে সহায়তা হয়। পুরাণে ও তন্ত্রে নানা দেবদেবীর রূপ ও গুণ ধ্যানের যে ব্যবস্থা আছে, ইহাই তাহার উপ-যোগিতা। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অনেকেই দেবদেবীগণকে আজগুবী কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু তাঁহারা কল্পনামাত্র হইলেও সেই সব কাল্পনিক রূপ ধ্যান করিয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধন করা যায়

এবং তাহাতে মন ও বুদ্ধির শক্তি বৰ্দ্ধিত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ দেবদেবীরা কল্পনামাত্র নহেন, যোগীরা যোগলব্ধ দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন। দেবদেবীরা যে শুধু আছেন তাহাই নহে, তাঁহারা মানুষকে তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিতে সর্বদাই সাহায্য করিতেছেন। দেবদেবীরা হইতেছেন ভগবানেরই আংশিক অভিব্যক্তি। ভগবানকে তাঁহার সমগ্রতায় অবধারণ করা সকলের পক্ষেই একেবারে সম্ভব হয় না। তাই আপন আপন প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে যাহার যে দেবদেবীতে স্বভাবতঃ নিষ্ঠা হয় তিনি তাঁহারই ধ্যান করিতে পারেন, তিনিই তাহার ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবী হইয়া ভক্তকে শ্রেয়োমার্গে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবেন। দেবদেবীরা আছেন, তবে সাধারণ মর্ত্ত্য জীব, জন্তু, মানুষের ন্যায় তাঁহারা কোন বিশেষ দেহে বা রূপে সীমাবদ্ধ নহেন—একই দেবদেবীকে ভিন্ন ভিন্ন ভক্ত আপন আপন শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেন। তাই বাহ্যতঃ ধর্মে ধর্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত পার্থক্য, এমনকি বিরোধও দেখা যায়। কিন্তু প্রথম প্রথম যে কোন ধ্যেয় বিষয় অবলম্বন করিয়া চিত্তকে একাগ্র করিতে অভ্যাস করা হউক, সমগ্র ও পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত ভগবান পুরুষোত্তমেই চিত্তকে একাগ্র করিয়া তাঁহার নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা তাঁহার সাদৃশ্য ও সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়া পরম পূর্ণতা লাভ করিতে পারিব (৬।৩০,৩১,৪৭)।

যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে পাঁচ প্রকার যম ও পাঁচ প্রকার নিয়মকে যোগ সাধনার প্রাথমিক অঙ্গ বলা হইয়াছে, গীতা এইরূপ গণাগাঁথা কোন ব্যবস্থা না দিয়া সাধারণ ভাবেই বলিয়াছে, যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ, মানসিক চেতনা ও ইন্দ্রিয়-সকলকে সংযত করিয়া যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। পাতঞ্জলীয় যম ও নিয়মগুলির মধ্যে গীতা এখানে চারিটি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছে—অপরিগ্রহ, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য ও ঈশ্বরপ্রণিধান, আর এই যম ও নিয়মগুলিকেও গীতা উদার অর্থে গ্রহণ করিয়াছে। একটির পর একটি করিতে হইবে এমনও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই—সবই যথাসম্ভব এক সঙ্গে করিতে হইবে, কারণ যে-কোনটি ভাল করিয়া করা যায় তাহাতেই অপরটির সাহায্য হয়, একটিতে ত্রুটি হইলে অন্যটিরও ত্রুটি হয়। অন্য যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ ক্ষমা শৌচং তপোদমঃ।
সন্তোষঃ সত্যমাস্তিক্যং ব্রতাঙ্গানি বিশেষতঃ।
একেনাপ্যথহীনেন ব্রতমস্য তু লুপ্যতে॥

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মনকে একাগ্র করিতে হইলে ইন্দ্রিয়গণের ইতস্ততঃ ধাবন বন্ধ করিতে হইবে। আবার ইন্দ্রিয়সংযমের উপায় হইতেছে চিত্তের একাগ্রতা। পাতঞ্জল দর্শনেই বলা হইয়াছে,

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি ২।৪১

শৌচ অভ্যাসের দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণের নির্মলতা হয়, তাহা হইতে সৌমনস্য অর্থাৎ মানসিক প্রীতি বা স্বত আনন্দ লাভ হয়। সৌমনস্য হইতে ঐকাগ্র্য হয়; ঐকাগ্র্য হইতে ইন্দ্রিয়জয় হয়; ইন্দ্রিয়জয় হইতে বুদ্ধিসত্ত্বের আত্মদর্শন ক্ষমতা হয়।

কেহ কেহ বলেন মনকে স্থির করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রাণকে স্থির করাই আবশ্যক। "প্রাণ আন্দোলিত হইলে স্বরূপ সত্তার আন্দোলন অনুভব হয়, ইহাই চিত্তেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। সুতরাং প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে চিত্তেন্দ্রিয়ও স্থির হইয়া যায়, তাহাদের ক্রিয়া বন্ধ হয়। চিত্তের এই অক্রিয়াবস্থাই আত্মার স্বরূপ।" স্বামী বিবেকানন্দও এই কথা বলিয়াছেন—

"The whole scope of Rajayoga is really to teach the control and direction in the different planes of the Prana. When a man has concentrated his energies he masters the Prana that is in his body. When a man is meditating, he is also concentrating his Prana."

পাতঞ্জল দর্শনেও বলা হইয়াছে, প্রণায়ামের দ্বারা চিত্তের স্থিতি হয় (পা ১।৩৪)। কিন্তু প্রাণ কী? স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সুবিখ্যাত "রাজযোগ" গ্রন্থে বলিয়াছেন—প্রাণই জগতের মূল শক্তি, ঐ শক্তি হইতেই জগতের সকল শক্তি ও সকল ক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছে। অতএব প্রাণকে জয় করিতে পারিলে সমস্ত জগৎকে জয় করা যায়—প্রণায়াম অভ্যাসে এই শক্তি লাভ হয়।

"Out of this Prana is evolved everything that we call energy, everything that we call force. It is the Prana that is manifesting as motion; it is the Prana that is manifesting as gravitation, as magnetism. It is the Prana that is manifesting as the actions of the body, as the nerve currents, as thought force. From thought down to the lowest force, everything is but the manifestation of Prana.···The sum total of all force in the universe, mental or physical, when resolved back to their original state, is called Prana. The knowledge and control of this Prana is really what

is meant by Pranayama. This opens to us the door to almost unlimited power. Suppose, for instance a man understood the Prana perfectly, and control it, what power on earth would not be his? He would be able to move the sun and stars out of their places, to control everything in the universe, from the atoms to the biggest suns, because he would control the Prana. This is the end and aim of Pranayama" (Raja-Yoga pp83, 84, Mayavati edition)

অর্থাৎ, "এই প্রাণ হইতেই সমুদয় শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে—এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা চৌম্বুকাকর্ষণ-শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই দৈহিক সমুদয় ক্রিয়ারূপে, স্নায়বিকশক্তিপ্রবাহরূপে এবং চিন্তাশক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। চিন্তাশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য দৈহিক শক্তি পর্য্যন্ত সমুদয়ই প্রাণের বিকাশ মাত্র। বাহ্য ও অন্তর্জগতের সমুদয় শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় গমন করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে।....এই প্রাণের প্রকৃত তত্ত্ব জানা ও উহাকে সংযম করিবার চেষ্টাই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ। এই প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে আমাদের যেন অনন্ত শক্তির দ্বার খুলিয়া যায়। মনে কর যেন কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন ও উহাকে জয় করিতেও কৃতকার্য্য হইলেন। তাহা হইলে জগতে এমন কি শক্তি আছে, যাহা তাঁহার আয়ত্ত না হয়? তাঁহার আজ্ঞায় চন্দ্রসূর্য্য স্বস্থানচ্যুত হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম সূর্য্য পর্য্যন্ত তাঁহার বশীভূত হয়, কারণ তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন। ইহাই প্রাণায়াম সাধনের লক্ষ্য।"

প্রাণশক্তি ও প্রাণায়ামের লক্ষ্যের এই বর্ণনা বিবেকানন্দের নিজস্ব—ভারতীয় যোগশাস্ত্রের সহিত ইহার মিল নাই। বিবেকানন্দ আমেরিকাতে যোগ সম্বন্ধে এই বক্তৃতা প্রদান করেন—পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ যাহাতে যোগের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে সম্ভবতঃ সেইজন্যই তিনি পাশ্চাত্য মন, পাশ্চাত্য ভাবের উপযোগী করিয়া রাজযোগের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন জড়শক্তি যেমন চৌম্বকশক্তি, এবং মননশক্তি যেমন চিন্তা এ-সবই হইতেছে মূল প্রাণ শক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ—কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে জড়শক্তি, প্রাণশক্তি ও মানসশক্তি, দেহ, প্রাণ, মন এই তিনকে সর্বত্রই পৃথক করা হইয়াছে—দেহের মধ্যে প্রাণ রহিয়াছে, প্রাণের মধ্যে মন রহিয়াছে বটে তাহা হইলেও এই তিনটি তত্ত্ব এক নহে। অথবা একটি অপরটির প্রকাশ মাত্র নহে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে পরমতত্ত্ব ব্রহ্মকে অনু-

ময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (৩।২-৬)। উপনিষদে জড় (Matter) বুঝাইতে অন্ন শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্নময় আত্মার কথা বর্ণনা করিয়া পরে বলা হইয়াছে, "অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণ" (তৈত্তিরীয় ২।২)—অন্নময় আত্মার অন্তরে প্রাণময় আত্মা আছেন। "প্রাণময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ··· মনোময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" (তৈত্তিরীয় ২।৩-৪), প্রাণময়ের অন্তরে মনোময় আত্মা, মনোময়ের অন্তরে বিজ্ঞানময় আত্মা, এইরূপ বলিয়া "বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ (২।৫) এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে জড় (অন্ন), প্রাণ, মন ইত্যাদি হইতেছে ব্রহ্মের বিভিন্ন উপাধি, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ক্রমে এখানে তাহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে।

অতএব কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, প্রাণই হইতেছে জড়, মন প্রভৃতির মূল? বস্তুতঃ ইহারা সকলেই এক সত্তা হইতে উৎপন্ন—সকলেই আত্মা হইতে উৎপন্ন। ইহাই বেদান্তের অদ্বৈত। বিবেকানন্দ দেখাইয়াছেন যে বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও অন্যদিক হইতে উপনীত হইয়াছে। কারণ বিজ্ঞানও বলিতেছে যে, জগতের মূলে এক শক্তি রহিয়াছে—জগতের সকল ক্রিয়া, সকল গতি হইতেছে ঐ একই শক্তির খেলা—কিন্তু বিজ্ঞান ঐ মূল শক্তিকে চৈতন্যময় বলিয়া স্বীকার করে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান উহাকে স্পষ্টতঃই জড়শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। বিবেকানন্দ ঐ মূল শক্তিকেই প্রাণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন বিবেকানন্দ আমেরিকাতে এই বক্তৃতা দিতেছিলেন—তখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরও মতের পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে—বিজ্ঞান তখন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ঐ মূল শক্তিকে একেবারে স্থূল জড় শক্তি বলা চলে না। বিজ্ঞানের মতের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশে দার্শনিকদের মধ্যেও এক নূতন মতবাদের উদ্ভব হয়, তাহার নাম vitalism, প্রাণবাদ। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ (Bergson) বিশেষ শক্তির সহিত এই মত প্রচার করেন—তিনি বলেন জগতে যে মূল শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহা জড় নহে, তাহা প্রাণশক্তি, Elan vital, স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক মত ইহারই অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে এই মূল শক্তিকে প্রাণ বলিয়া কোথাও অভিহিত করা হয় নাই। বেদান্তমতে আদ্যাশক্তি হইতেছে অধ্যাত্ম শক্তি, চিৎশক্তি,—তাহা হইতেই জাগতিক যত বস্তু, যত ক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছে। এই শক্তি

আত্মারই শক্তি। আত্মা' হইতেছে সৎ, চিৎ, আনন্দ। আত্মার চিৎ-শক্তিই জগদাকারে আকারিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—"আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশা…আত্মত আকাশ…আত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মত-শ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্প আত্মতো মন আত্মতো বাক্ ·আত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্মাণ্যাত্মত এবেদং সর্বমিতি" (৭।২৬।১) যেমন আকাশাদি স্থূল ভূত আত্মা হইতে উদ্ভূত, তেমনই প্রাণ, মন, মনের সকল ক্রিয়া, এ বিশ্বে যাহা কিছু আছে "সর্বমিতি" আত্মা হইতেই উদ্ভূত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, যোগ সাধনার দ্বারা প্রাণকে জয় করিতে পারিলে সমগ্র বিশ্বজগৎকে নিজের আয়ত্ত করা যায়, চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রকে কক্ষচ্যুত করা যায়। মূল আদ্যা শক্তিকে বশ করিতে পারিলে এ-সবই সম্ভব—কিন্তু মানুষ কি কখনও তাহা আশা করিতে পারে? যোগসাধনার লক্ষ্য সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী পরমা আদ্যাশক্তিকে বশীভূত করা নহে, বরং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাহারই বশীভূত করিয়া দেওয়া—যেন জগন্মাতা আমাদের ভিতর দিয়া, আমাদিগকে যন্ত্র করিয়া জগতে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

জড়শক্তি, প্রাণশক্তি, মননশক্তি—এ-গুলি মূলতঃ আদ্যা চিৎশক্তিরই বিভিন্ন রূপ ও ক্রিয়া হইলেও—ইহাদের লক্ষণ ও ক্রিয়ায় যে ভিন্নতা আছে তাহা উপেক্ষা করা চলে না। মাধ্যাকর্ষণশক্তি, চৌম্বকশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি—এ সব হইতেছে জড়শক্তি, Material Energy; আর যে শক্তি জীবের দেহযন্ত্রকে রক্ষা করিয়া জীবনের উপযোগী ক্রিয়া-সকলকে পরিচালিত করিতেছে তাহাই প্রকৃত পক্ষে প্রাণশক্তি, Vital Energy. আর যে শক্তির দ্বারা আমরা চিন্তা করি, জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করি—তাহাই হইতেছে মননশক্তি, Mental Energy. মোটামুটি এইরূপ প্রভেদ দেখান যাইলেও, Vital Energy বা প্রাণ বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। জড়বাদীরা বলেন প্রাণ হইতেছে জড়শক্তিরই সূক্ষ্মক্রিয়া এবং মনন হইতেছে তাহারই আরও সূক্ষ্মতর ক্রিয়া। কিন্তু জড়ের ক্রিয়ায়, প্রাণের ক্রিয়ায়, মনের ক্রিয়ায় এত প্রভেদ যে শেষোক্ত দুইটিকে কখনই জড়ের ক্রিয়া বলা সঙ্গত হয় না। কালিদাস শকুন্তলা রচনা করিলেন—তাহা তাঁহার মস্তিষ্কের কোষ-গুলির একপ্রকার যন্ত্রবৎ নৃত্যের ফল—এরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত বা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তেমনই যে শক্তি বাহির হইতে আগত খাদ্যকে আমাদের শরীরগত রক্তমাংসে পরিণত করিতেছে, আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর বোধশক্তিকে সজাগ রাখিতেছে তাহা জড়পরমাণুর অন্ধক্রিয়া ইহাও স্বীকার করা কঠিন। জড়পরমাণু প্রাণের ক্রিয়া করিতেছে এমন ত কোথাও দেখা

যায় না। কিন্তু প্রাণের যে বিশিষ্ট ক্রিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ কী? প্রাণ বলিতে ঠিক কী বুঝায়, শাস্ত্র হইতে তাহা নির্ণয় করা কঠিন—কারণ বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রাণকে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাণ শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াও বিষয়টিকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন প্রাণ একরকম বাতাস। কেহ মৃত্যু মুখে পতিত হইলে বলা হয় প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত প্রাণ-ক্রিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এইরূপ ধারণা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণের একটি ক্রিয়া মাত্র, উহাই প্রাণ নহে। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিয়াও মানুষ অনেক দিন জীবিত থাকে এমন দেখা গিয়াছে। বেদান্ত শাস্ত্রেও বলা হইয়াছে যে প্রাণ বায়ু নহে, "ন বায়ু ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ"। বায়ুর মতো দেহের মধ্যে সঞ্চরণ করে বলিয়া প্রাণ বায়ু নামে খ্যাত। কপিলাশ্রমীয় যোগদর্শনে এ-বিষয়ে শাস্ত্রমত সঙ্কলন করিয়া বলা হইয়াছে যে, "প্রাণ চক্ষুরাদির ন্যায় এক প্রকার করণ শক্তি। যাহার দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহার নাম করণ। যেমন ছেদন ক্রিয়ার করণ কুঠার, সেই হেতু ইন্দ্রিয়গণকে করণ বলা যায়। কর্ণের দ্বারা শব্দজ্ঞান সিদ্ধ হয়, অতএব উহা জীবের করণ। চক্ষু হস্তাদিও সেইরূপ। তদ্বৎ যে শক্তিদ্বারা জীবের দেহধারণ সিদ্ধ হয়, তাহাই প্রাণনামক করণ-শক্তি।" প্রশ্নশ্রুতিতে আছে প্রাণ বলিতেছেন যে, আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া অবষ্টম্ভনপূর্বক এই শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছি। যে পঞ্চ প্রকার শক্তির দ্বারা দেহধারণ সুসম্পন্ন হয় তাহারাই পঞ্চ প্রাণ। তাহাদের নাম—প্রাণ, উদান, ব্যান অপান ও সমান। সুখ দুঃখের বোধই হইতেছে প্রাণের কার্য্য—এই বোধকে অবলম্বন করিয়া উদানাদি অন্যান্য প্রাণের ক্রিয়া পরিচালিত হয় বলিয়াই ইহাকে আদ্য প্রাণ বলা যায়। শাঙ্কর ভাষ্যে বলা হইয়াছে প্রাণঃ প্রাক্‌বৃত্তিরুচ্ছ্বাসাদিকর্মা (২।৪।১১)—প্রাণ প্রাক্‌বৃত্তি, তাহা শ্বাসাদিকর্মা। কিন্তু শ্বাসাদি কর্মের মূল প্রেরণা আসে বোধ হইতে। "শ্বাসক্রিয়া নিম্নপ্রকারে নিষ্পন্ন হয়। প্রশ্বাসের সময় ফুস্‌ফুস্‌—কুক্ষিস্থ বায়ুকোষ-সকল সঙ্কুচিত হয়, তাহাতে তত্রত্য বোধ-নাড়ী (Sensory nerves) মস্তিষ্কের অংশবিশেষকে জানাইয়া দেয়। তাহাতে নিশ্বাস লইবার প্রযত্ন হয়। সেইরূপ নিশ্বাসান্তে বায়ুকোষ সকলের স্ফীতিতে সেই বোধনাড়ী-সকল মস্তিষ্কে উদ্রেগ্‌বিশেষ বহন করিয়া শ্বাস ফেলিবার প্রযত্ন আনয়ন করে। অতএব শ্বাসক্রিয়ার মূল ফুস্‌ফুস-ত্বগ্‌গত সেই বোধ-নাড়ী* সুতরাং চক্ষুরাদিস্থ

---

* "A sensation, the need of breathing,···is normally connected

যে প্রকার নাড়ীতে (বোধবহা) প্রাণস্থান, শ্বাসযন্ত্রেও সেই প্রকার নাড়ীতে প্রাণবৃত্তি হইবে। তজ্জাতীয় অন্যত্রস্থ বোধ-নাড়ীতেও প্রাণস্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে।"—(যোগদর্শন)

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আদ্য প্রাণের এই লক্ষণ হয়, প্রাণীর শরীর কোন প্রকারে উদ্রিক্ত হইলে তাহার মধ্যে যে বোধ-সকল (Sensation) উৎপন্ন হয়, তাহাদের যাহা অধিষ্ঠান তাহা ধারণ (নির্মাণ, বর্দ্ধন, পোষণ) করাই আদ্য প্রাণের কার্য্য। সকল প্রাণক্রিয়াই উদ্বেজনার (Stimulies) দ্বারা চালিত—কোন শক্তি শরীরেব উপব ক্রিয়া করিলে বোধ-নাড়ীর দ্বাবা তাহা মস্তিষ্কে কিম্বা মেরুদণ্ডে বোধকেন্দ্রে স্পন্দন উদ্রেক করে—সেই স্পন্দন শরীরে প্রাণধারণের ক্রিয়া-সকল সম্পন্ন করে। এই বোধ-সকলের মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা সচেতন—এবং সাধারণতঃ ইহাকেই প্রাণের ক্রিয়া বলা হয়। কিন্তু এমন সব উদ্বেজন প্রাণক্রিয়াব মধ্যে চলিতেছে যে-সব সম্বন্ধে আমাদের মন সচেতন নহে—যেমন পাকাশয়ের ক্রিয়া, রক্ত-সঞ্চালন ইত্যাদি প্রাণ ক্রিয়া আমাদেব মধ্যে চলিতে থাকিলেও আমরা সে-সব সম্বন্ধে সজ্ঞান নই। অথচ তাহাদের মূলে একটা অবচেতন বোধ আছে—এই যে শরীরের আভ্যন্তবিক অবচেতন বোধেব দ্বারা প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হয়—এইটিই উদানেব কার্য্য। উদ্বেজযতি মর্মাণি উদানো নাম মারুতঃ (যোগার্ণব)। "সর্বপ্রকাব চালন শক্তিব যে অধিষ্ঠান তাহা ধারণ (নির্মাণ, পোষণ ও বর্দ্ধন) করা ব্যানের কার্য্য। চালন কার্য্য পেশী সঙ্কোচনের দ্বারা সিদ্ধ হয় অতএব সঙ্কোচনেব হেতুভূত সমস্ত মার্গেই (স্নায়ুতে ও পেশীতে) ব্যানের স্থান। অপান মল-অপনয়নকারী শক্তি।, আর ত্রিবিধ আহার্য্যকে সমনয়ন করা বা শরীরোপাদানরূপে পরিণত কবা সমানের কার্য্য।" (যোগদর্শন)।

উপরে যে পঞ্চবিধ প্রাণের কথা বলা হইল—বস্তুতঃ ঐ সবই হইতেছে প্রাণধারণের সাধারণ প্রণালী। সাধারণতঃ আমরা প্রাণ বলিতে বুঝি ইত-স্ততঃ চলাচলের শক্তি, শ্বাস প্রশ্বাস, আহার্য্য গ্রহণ, সুখদুঃখ বোধ, ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ। কিন্তু এ-সব হইতেছে প্রাণের প্রক্রিয়া, বস্তুতঃ প্রাণ নহে। প্রাণের যাহা প্রকৃত কার্যা, এ-সব প্রক্রিয়া ব্যতীতও প্রাণ তাহা সম্পন্ন করিতে পারে।

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া এমন কি হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ করিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে। না খাইয়া মানুষ অনেকদিন বাঁচিতে

with the performance of respiration."

—The Cornhill Magazine, Vol V, P. 164.

পারে। তাহা হইলে প্রাণ কি? তাহার মূল ক্রিয়া কি? মূলতঃ ইহা হইতেছে বিশ্বশক্তির একটি বিশিষ্ট রূপ—এইটিকে প্রাণশক্তি, Vitality, Vital Energy বলা যায়। এই প্রাণ নিজের আধার স্বরূপ নানা দেহের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদের মধ্যে শক্তিস্রোতরূপে প্রবাহিত হইতেছে, এই জন্য দেহের উপাদানকে ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিতেছে, ধ্বংস করিতেছে আবার নূতন উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেহকে কর্মক্ষম রাখিতেছে। এইদিক দিয়া দেখিলে মৃত্যুকেও প্রাণেরই একটি ক্রিয়া বলিয়া ধরিতে হয়—কারণ প্রতি মুহূর্ত্তেই দেহের মধ্যে ধ্বংস ক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে নির্মাণ ক্রিয়া চলিতেছে। যাহাকে আমরা মৃত্যু বলি, তাহাতেও ঐ প্রাণ ধ্বংস হয় না, অন্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া আবার সে নিজ ক্রিয়ার জন্য নূতন দেহ গঠন করিয়া লয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

অখণ্ড জীবন যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে।

প্রাণ দেহের মধ্যে যে শক্তির স্রোত চালাইতেছে তাহা হইতেই বোধের উদ্ভব হয়, ঐ বোধই ক্রমে সুখ দুঃখের অনুভূতিতে পরিণত হয়, এবং ঐ অনুভূতিকে ভিত্তি করিয়াই ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির বিকাশ হয়। অতএব প্রাণ হইতেছে বিশ্বশক্তির সেই ক্রিয়া যাহা জড়কে সংগঠিত করিয়া তাহার মধ্যে সুখ দুঃখ বোধ, মানস চেতনা, বুদ্ধি প্রভৃতির বিকাশকে সম্ভব করিয়া তোলে।* অন্য দিক হইতে বলা যায় যে মনই জড়দেহে নিজকে প্রকট করিবার জন্য প্রাণশক্তিকে ব্যবহার করিয়া নিজের প্রকাশের উপযোগী দেহ ইন্দ্রিয়াদি গঠন করিতেছে। বস্তুতঃ সাংখ্যদর্শনে প্রাণকে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া গণ্য করা হয় নাই—উহাকে অন্তঃকরণের অর্থাৎ মন-বুদ্ধিরই একটি শক্তি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। সাংখ্যকারিকায় আছে "সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ" অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ অন্তঃকরণত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বা পরিণাম।

অথচ দেখা যায় যেখানে মনবুদ্ধির বিকাশ হয় নাই সেখানেও প্রাণ রহিয়াছে—যথা বৃক্ষ লতা। জন্তুর মধ্যে প্রাণের যে-সব ক্রিয়া চলে, উদ্ভিদের মধ্যে সে-সব তেমন পরিস্ফুট নহে। উদ্ভিদ্ গতিশক্তিহীন, শ্বাসপ্রশ্বাসহীন, তাহার মস্তিষ্ক নাই, হৃদয় নাই, পাকস্থলী নাই, স্নায়ুমণ্ডল নাই—প্রাণ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি তাহার অনেক লক্ষণই

---

* মনো বুদ্ধিরহংকারো ভূতানি বিষয়শ্চ সঃ।
এবং ত্বিহ স সর্ব্বত্র প্রাণেন পরিচাল্যতে॥

—মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব, ১৮৫

উদ্ভিদে নাই। তথাপি উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার জন্ম আছে, বয়সের অনুপাতে বৃদ্ধি ও বিকাশ আছে, জরা ব্যাধি মৃত্যু আছে, বংশবৃদ্ধি আছে, খাদ্য গ্রহণ আছে, আলোক ও তাপের উপর নির্ভরতা আছে। আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হইতেছে যে তাহার একপ্রকার সুখদুঃখ বোধও আছে। তবে প্রাণী-দেহের সংগঠন হইতে উদ্ভিদদেহের সংগঠন বিভিন্ন—উদ্ভিদ হইতেছে জড় ও জন্তু এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। তাহা হইলে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে জড়ের মধ্যেও প্রাণ আছে। তবে সেখানকার সংগঠন উদ্ভিদ ও জন্তু হইতে বিভিন্ন। বস্তুতঃ জড়ের মধ্যে প্রাণ না থাকিলে কেমন করিয়া কোথা হইতে প্রাণের আবির্ভাব হইল? প্রাণ সর্বত্রই আছে—* যেমন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মধ্যে তেমনই ক্ষুদ্রতম জড় পরমাণুর মধ্যে—তবে সর্বত্র তাহার ক্রিয়া, তাহার প্রকাশ, তাহার সংগঠন এক প্রকার নহে—

প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ, তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে। —তৈত্তিরীয় ২।৩

"প্রাণশক্তিই ভূতসকলের আয়ু, সেই জন্যই ইহাকে সর্বব্যাপী প্রাণ বলা হয়"।

কিন্তু জড়ের মধ্যে যে প্রাণ রহিয়াছে তাহার ত কোন লক্ষণ দেখা যায় না—সেখানে প্রাণ কি ভাবে আছে, কি করিতেছে? ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই প্রাণ কি, প্রাণের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জানা যাইবে। কখনও কখনও দেখা যায় মানুষ মৃতবৎ হইয়া গিয়াছে, প্রাণের কোন লক্ষণই নাই—অথচ কিছু সময় পরে সে আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে। প্রাণ যদি তাহার দেহ ছাড়িয়া যাইত, তাহা হইলে আবার ফিরিয়া আসিল কেমন করিয়া? দেহের সহিত সে প্রাণের ত সব সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। বস্তুতঃ এরূপ ক্ষেত্রে প্রাণ থাকে, তবে তাহার বাহ্য ক্রিয়া সব বন্ধ হইয়া যায়। প্রাণের একটি লক্ষণ হইতেছে বাহির হইতে আগত আঘাতে সাড়া দেওয়া। সূক্ষ্ম যন্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে স্বর্ণ রৌপ্য আদি খনিজ দ্রব্যে (metals) এইরূপ সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু যেমন নিশ্বাস প্রশ্বাস তেমনিই বাহ্য আঘাতে সাড়া দেওয়ায় হইতেছে প্রাণের বাহ্যিক লক্ষণ। যেখানেই প্রাণ আছে সেখানেই তাহার পিছনে একটা ইচ্ছাশক্তি আছে, টিকিয়া থাকিবার বর্দ্ধিত হইবার, আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার প্রবৃত্তি আছে—এবং ইহার জন্যই প্রাণ বাহিরের আঘাতে সাড়া দেয়—অর্থাৎ সেই আঘাতকে নিজ পুষ্টির কাজে লাগাইতে চায়, যে-শক্তি হইতে আঘাত আসিতেছে তাহার সহিত আদান প্রদানের

* প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি

—মুণ্ডক ৩।১।৪

দ্বারা, শক্তিবিনিময়ের দ্বারা নিজেকে বর্দ্ধিত করিতে চায়—ইহাই প্রাণের মূল ক্রিয়া ; দেহের সংগঠন যখন সমৃদ্ধতর পূর্ণতর হইয়া উঠে তখন এই মূল ক্রিয়াই বিভিন্ন রূপ ধরিয়া প্রকাশিত হয়, এবং সেই সকলকেই আমরা সাধারণতঃ প্রাণের ক্রিয়া বলিয়া গণ্য করি। স্বয়ংচালিত হইয়া গমনাগমন করা, শ্বাসপ্রশ্বাস, আহার এ-সব হইতেছে প্রাণের বিভিন্ন ক্রিয়া, প্রকৃত প্রাণ নহে ; এইসব ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণ তাহার আধার-স্বরূপ দেহটাকে ধ্বংস ও গঠনের দ্বারা সজীব রাখে এবং তাহার মধ্যে নিজশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যরকম ক্রিয়ার দ্বারাও এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

অনেকের ধারণা খাদ্য গ্রহণ না করিলে প্রাণের ক্ষতি হয়— কিন্তু এ-ধারণা ভুল। খাদ্যাভাবে দেহটাই ক্রমশঃ ক্ষয় হয়, এবং সেইসব অংশ প্রথমেই ক্ষয় হয় যেগুলি অসুস্থ, রুগ্ন বা অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয়। প্রাণ অন্যভাবে বিশ্বের প্রাণস্রোত হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া নিজেকে রক্ষা করে—বিশ্বে সর্বত্র যে প্রাণস্রোত বহিতেছে তাহা হইতেই প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে পুষ্ট করে। উপবাসের দ্বারা দেহের ক্ষয় যখন এতদূর অগ্রসর হয় যে সেখানে আর প্রাণের ক্রিয়া চলিতে পারে না, তখনই প্রাণ সেই দেহকে ধ্বংস করিয়া সেখান হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া লয়, নিজের উপযোগী অন্য দেহ গঠন করিতে অগ্রসর হয়। আহার গ্রহণ না করিলে যে প্রাণ বিনষ্ট হয় না তাহার প্রমাণ ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়। ঋষি তাহার পুত্রকে বলিতেছেন—

"পঞ্চদশাহানি মাশীঃ কামময়ঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যত ইতি"—৬।৭।১

"তুমি পনেরো দিন ভোজন করিও না, কেবল যথেচ্ছ জলপান কর। প্রাণ জলময়, অতএব জল পান করিলে জীবন নাশ হইবে না।" দেখা গিয়াছে শুধু জল খাইয়া মানুষ বহুদিন, ৫০।৬০ দিনেরও অধিক বাঁচিতে পারে—তাহার পর সাবধানে আহার্য্য গ্রহণ করিলে প্রাণ সেই আহার্য্য হইতে দেহকে নূতন করিয়া গঠন করিয়া লয়—এই ভাবে উপবাসের দ্বারা অনেকে কঠিন পুরাতন ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। উপবাসের সময় প্রাণ দেহকে কেমন করিয়া রক্ষা করে সে-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে প্রাণের নিগূঢ় তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়।—

"Dr. Dewey cites from a physiologist named Dr. Yeo details of the loss in weight, during a long fast, of different parts of the body, which go to show that there is some mysterious Power behind the vital processes, which knows how to take care of the body. It is seen that the loss of weight is not the same for all the different tissues of the body ; some are sacrificed, or rather got rid of ; others lose a little, and some nothing at all ; among those

that lose no weight, even in a long fast, is the brain. This makes it possible for the body to be rebuilt on better lines after a long fast. This also explains the fact that fasting is after all not dangerous to life."..**The Fasting Cure** by S. K. Lakshman.

"সুদীর্ঘ উপবাস কালে দেহের বিভিন্ন অংশের ওজন যে-ভাবে হ্রাস পায় তাহা হইতে বুঝা যায় যে প্রাণক্রিয়া-সকলের পশ্চাতে এমন এক রহস্যময় শক্তি আছে যে জানে যে, কেমন করিয়া দেহকে রক্ষা করিতে হয়। দেখা যায় যে, সকল অংশের ওজন সমান ভাবে হ্রাস পায় না; কতকগুলিকে একেবারেই ধ্বংস হইতে দেওয়া হয়, অন্যগুলির ওজন খুব কমই হ্রাস পায়, কতক অংশ কিছুই ক্ষয় হয় না। সুদীর্ঘকাল উপবাস করিলেও শরীরের যে সব যন্ত্র আদৌ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে Brain, মস্তিষ্ক। সেই জন্যই উপবাসের পর দেহকে উৎকৃষ্টতর ভাবে গঠন করা সম্ভব হয়। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় কেন উপবাস জীবনের জন্য বিপজ্জনক নহে।"

দুর্ভিক্ষের সময় যাহারা খাইতে না পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, বস্তুতঃ পক্ষে অনাহারই তাহাদের মৃত্যুর কারণ নহে। ভয় পাইয়া তাহারা অখাদ্য ভক্ষণ করে, নানা অনিয়ম করে এইভাবে তাহারা নানা রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে জলের সূক্ষ্মাংশ প্রাণ, অন্নের সূক্ষ্ম অংশ মন—ইহার নিগূঢ় অর্থ এই যে, আমরা যাহাকে জড় জগৎ বলি বস্তুতঃ তাহা প্রাণ, মন প্রভৃতির ন্যায় অধ্যাত্ম শক্তিরই বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন ক্রিয়া। সেই অধ্যাত্মশক্তি ভগবানেরই চিৎশক্তি, মন যেমন তাহার একটি ক্রিয়া, প্রাণ তাহার একটি ক্রিয়া, তেমনই জড়ও তাহার একটি ক্রিয়া। এই সমস্ত জগৎই চিন্ময়। প্রাণ চিৎশক্তির ক্রিয়া, তাই প্রাণের ক্রিয়ার মধ্যে গভীর বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, বিশ্বমাঝে অনবরত এক ক্রিয়াত্মিকা শক্তির খেলা চলিতেছে, তাহা স্থূল, সূক্ষ্ম নানাবিধ জড়রূপ বা দেহ গ্রহণ করিতেছে; সেইরূপ প্রত্যেক জড়দেহে, তাহা ধাতব দেহ হউক অথবা উদ্ভিদের দেহ হউক অথবা জন্তুর দেহ হউক—প্রত্যেক দেহের মধ্যে ঐ একই ক্রিয়াত্মিকা শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে, কাজ করিতেছে—এই দুইয়ের মধ্যে যে একটা আদান প্রদান চলিতেছে সেইটিই হইতেছে প্রাণশক্তির স্বরূপগত ক্রিয়া। মানস-শক্তি, প্রাণশক্তি, জড়শক্তি এ-সবই হইতেছে এক বিশ্বশক্তিরই বিভিন্ন ক্রিয়াত্মিকা প্রকাশ।

জড়ের মধ্যে সুখ দুঃখ বোধ নাই, চেতনা নাই, জ্ঞান নাই। জড়ের লক্ষণ এমন একটা সংহতি যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া পড়ে না, যাহা বাধা দেয়,

যাহা নিজেকে স্থায়ী করিয়া রাখে। এক ব্রহ্ম যখন বহুর মধ্যে নিজেকে প্রকট করিতে চাহিলেন তখন ভিন্ন ভিন্ন বহু দেহ গঠনের জন্য এইরূপ জড় উপাদানই প্রয়োজন—তাই জড়ই হইয়াছে এই জগতে সচ্চিদানন্দের আত্মপ্রকাশের ভিত্তি স্বরূপ, তাঁহারই শক্তি এক প্রকার ক্রিয়ায় এই জড়রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সেই জড়ে যাহাতে চেতনার প্রকাশ পায় সেই ব্যবস্থা যে প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা হইতেছে তাহাই প্রাণশক্তির ক্রিয়া। এই ক্রিয়ায় দেহের ক্রমবিবর্তন অগ্রসর হইলে তখন তাহার মধ্যে মনের বিকাশ, মানসিক চেতনার বিকাশ সম্ভব হয়। তাই প্রাণ হইতেছে জড় ও মনের মধ্যবর্তী। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন,

"When we study this Life as it manifests itself upon earth with Matter as its basis, we observe that essentially it is a form of the one cosmic Enegy, a dynamic movement or current of it positive and negative, a constant play of the Force which builds up forms, energises them by a continual stream of stimulation and maintains them by an unceasing process of disintegration and renewal of their substance." (The Life Divine, Vol. I p. 269),

অর্থাৎ, "এই প্রাণ পৃথিবীতে জড়কে ভিত্তি করিয়া যে-ভাবে প্রকট হইতেছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই উহা হইতেছে একই বিশ্বশক্তির একটি রূপ, উহারই একটি ক্রিয়াত্মিকা গতি বা প্রবাহ, উহা নানা দেহ গঠন করিতেছে, তাহাদিগকে অনবরত উদ্রিক্ত করিয়া শক্তিময় করিয়া রাখিতেছে, এবং সর্বদা ধবংস ও পুনর্গঠনের দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে।" জড়ের মধ্যে, জড়পরমাণুর মধ্যেও প্রাণ রহিয়াছে, প্রাণের স্পন্দন চলিতেছে, কিন্তু তাহা অবচেতনভাবে চলিতেছে, তাই মনে হয় তাহা যান্ত্রিক, অজীবিত, জীবিত নহে। কিন্তু বস্তুতঃ সেখানেও প্রাণ কাজ করিতেছে, ঐ অণুপরমাণুর দেহকে সৃষ্টি করিতেছে আবার ভাঙ্গিয়া দিতেছে—কিন্তু তাহার গঠন এমন নহে যেখানে বোধের, চেতনার, জ্ঞানের প্রকাশ পাইতে পারে। জড়ের মধ্যে স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার করিয়া প্রাণ সেখানে বোধ ও চেতনার প্রকাশ সম্ভব করিতেছে—এবং ব্যষ্টিগত দেহের শক্তির সহিত বিশ্বশক্তির ঘাত প্রতিঘাত আদান প্রদানের ভিতর দিয়াই ঐ স্নায়বিক শক্তির ক্রিয়া বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, পরে তাহারই ভিতর দিয়া মানসিক চেতনা ও বুদ্ধির বিকাশ হইতেছে। যেখানে স্নায়বিক শক্তির খেলার বিকাশ হইয়াছে সেইখানে সেই শক্তিকেই সাধারণতঃ প্রাণ বলিয়া অভিহিত করা হয়, এবং ভারতীয় শাস্ত্রে প্রাণ বলিতে এই Nerve-energy বা স্নায়বীয় শক্তিই বুঝায়। কিন্তু বস্তুতঃ জন্তুর মধ্যে প্রাণ যে রূপ গ্রহণ

করিয়াছে কেবল সেইটিই হইতেছে স্নায়বীয় শক্তি; ঐ একই প্রাণশক্তি সর্বত্র রহিয়াছে, পরমাণুর মধ্যেও রহিয়াছে—সর্বত্র উহা মূলতঃ এক, সর্বত্র উহা হইতেছে চিৎ-শক্তির একই ক্রিয়া,—শক্তি নিজের স্থূল রূপকে ধরিয়া রহিয়াছে, পরিবর্তিত করিতেছে, তাহার মধ্যে বোধ ও মানসিক চেতনা নিহিত রহিয়াছে, নিগূঢ়ভাবে কর্ম করিতেছে, ক্রমবিবর্তনের দ্বারা ক্রমশঃ তাহা সম্মুখে প্রকট হইতেছে।

জড়ের উপর ক্রিয়া করিয়া প্রাণ এমন মানবীয় দেহ গঠন করিয়া দিয়াছে যাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত মন ও মানসিক চেতনার বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু মনই চিৎশক্তির শ্রেষ্ঠ বা চরম রূপ নহে—যেমন জড়ের মধ্যে প্রাণ লুকাইয়া আছে, প্রাণের মধ্যে মন লুকাইয়া আছে এবং ক্রমবিবর্তনের দ্বারা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে, তেমনই মনের মধ্যে বিজ্ঞান বা অতিমানস লুক্কায়িত রহিয়াছে, সম্মুখে আসিবার সুযোগ অপেক্ষা করিতেছে। জড়ের মধ্যে প্রাণ বা মন দেখা না যাইলেও যেমন তাহারা অন্তরালে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে, তেমনই মানুষের মধ্যে মনই প্রকট হইয়াছে, বিজ্ঞান দেখা যায় না —তথাপি তাহা পশ্চাতে থাকিয়া নিগূঢ় ভাবে কর্ম করিতেছে—বাহিরে মানবীয় দেহ, প্রাণ, মনের ক্রিয়াকে ভিতর হইতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে। কিন্তু তথাপি একটা আবরণ ও আড়াল রহিয়াছে—আমাদের অন্তরস্থিত এই বিজ্ঞানকে আমরা জানি না, তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ যোগ নাই—তাই আজও মানুষের দেহ, প্রাণ, মনে এত বিরোধ, এত বিশৃঙ্খলা, এত অপূর্ণতা। ঐ বিজ্ঞানকে সম্মুখে আনিয়া দেহ, প্রাণ, মনকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত করাই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। অতএব এই যে বর্তমান নরদেহ, যাহা ক্ষুদ্র অতৃপ্ত বাসনা-সকলের বশে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে, যাহাকে রক্ষা করিতে কত কষ্ট করিতে হইতেছে, যাহা জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীন, "প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত"—এইটিই মানব-জীবনের চরম সম্ভাবনা নহে। আমাদের অন্তরের মধ্যে যে-সব দিব্য শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে সম্মুখে আনিতে হইবে, বাহিরে প্রকট করিতে হইবে —ইহাই হইতেছে সকল যোগসাধনার লক্ষ্য। ইহার জন্য অন্তর্মুখী হইতে হয়, বাহ্য দেহ, প্রাণ, মনের ক্রিয়াকে যতদূর সম্ভব শান্ত করিতে হয়, যতচিত্তেন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ। রাজযোগ ইহারই একটি বিশিষ্ট প্রণালী। মনকে সংযত, স্থির, শান্ত, একাগ্র করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য—তবে মনের সহিত প্রাণের, প্রাণের সহিত দেহের নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে—তাই যোগের অঙ্গ হিসাবে আসনের দ্বারা শরীরকে স্থির করিবার, এবং প্রাণায়ামের দ্বারা স্নায়বিক প্রাণশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। তবে এ-সব অপরিহার্য্য নহে—পাতঞ্জল দর্শনও বলিয়াছে

প্রাণায়াম হইতেছে মন স্থির করিবার একটি উপায় মাত্র—অন্য উপায়ও আছে। বস্তুতঃ শান্ত নীরব আত্মার ধ্যান করিলে আপনা হইতেই সকল সত্তা শান্ত হইয়া আসে—তবে সেই ধ্যান করিবার জন্যও ইন্দ্রিয়াদি সংযত করা প্রয়োজন, তাই রাজযোগে যমনিয়মাদির ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাৎ। মনে হইতে পারে যে, ধ্যান উপাসনা যখন মানসিক ব্যাপার তখন শরীরকে কি ভাবে রাখিয়া ধ্যান করিতে হইবে তাহার কোন নিয়ম অনাবশ্যক। কিন্তু রাজযোগের লক্ষ্য হইতেছে চিত্তবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্যেয় বস্তুতে প্রবাহিত করা বা লীন করা ; ইহা গমনশীল বা ধাবমান অবস্থায় সম্ভব হয় না, গমন বা ধাবন চিত্তের বিক্ষেপজনক। দণ্ডায়মান অবস্থাতেও মনকে অনেকখানি দেহের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়, সেই অবস্থায় সূক্ষ্মদর্শন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। শয়ন করিয়া ধ্যান করিতে গেলেও সহসা নিদ্রা আসিয়া পড়ে। কিন্তু উপবেশন করিয়া ধ্যান করিলে এ-সমস্ত দোষ সহজে সাধককে স্পর্শ করিতে পারে না, নির্বিঘ্নেই ধ্যান সম্ভব হয়, অতএব উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান করাই বিধেয়। ধ্যানের সময় অঙ্গচেষ্টাসমূহের শিথিলতা প্রয়োজন, তাহা দণ্ডায়মান বা ধাবন অবস্থায় সম্ভব নহে, আবার শয়ন অবস্থায় নিদ্রার আগমন সম্ভব, তাই উপবেশন-পূর্বক ধ্যান করাই প্রশস্ত। ব্রহ্মসূত্রেও আছে, আসীন সম্ভবাৎ, উপবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ধ্যানাত্মক উপাসনা সম্ভব (৪।১।৭)। ব্রহ্মসূত্র ইহার সমর্থনে বলিয়াছে, স্মরন্তি চ (৪।১।১০) অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্রও এইরূপই বলেন। শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক সকলেই স্মৃতিশাস্ত্র বলিতে এখানে গীতার এই শ্লোক-দুইটিকেই বুঝিয়াছেন।. কিন্তু ব্রহ্মসূত্র গীতাকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিতেছে ইহা কি সম্ভব? আমরা দেখি গীতা ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ করিয়াছে (১৩।৫) অতএব গীতা ব্রহ্মসূত্রের পরে রচিত। স্মৃতিশাস্ত্র বলিতে ব্রহ্মসূত্র এখানে গীতা ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া মনে হয়। গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে যে অধ্যায় সমাপনপূর্বক সঙ্কল্প আছে তাহাতে গীতাকে স্মৃতিশাস্ত্র বলা হয় নাই, উপনিষদ, ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে। চিত্তকে একাগ্র করিয়া রাজযোগ প্রণালীতে যে ধ্যান করিতে হয় তাহা আসনে উপবিষ্ট হইয়াই করিতে হয়, ইহা বলাই এখানে গীতার উদ্দেশ্য। যথাযথ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে আসনাদির কোন নিয়ম নাই।

যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে। আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবে। যোগ শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু রাজযোগশাস্ত্রে উহার অর্থ হইতেছে চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা। অভ্যাস দ্বারা যথেচ্ছ যে-কোন বিষয়ে চিত্তকে নিশ্চল রাখিতে পারার নাম যোগ;

গীতা এখানে যোগ শব্দ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছে—এবং কোন্ বিষয়ে চিত্তকে নিশ্চল রাখা অভ্যাস করিতে হইবে তাহা ইহার পরেই উল্লেখ করিয়াছে—মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ। শ্রীকৃষ্ণরূপী পুরুষোত্তমে চিত্ত নিবিষ্ট রাখা অভ্যাস করাই গীতার রাজযোগ। গীতা আত্মাতেও মন স্থির করিবার কথা বলিয়াছে (৬।১৮,২৫), কিন্তু আত্মা পুরুষোত্তম হইতে কোন বিভিন্ন বস্তু নহে—উহা পুরুষোত্তমেরই একটি ভাব—তিনি একভাবে আত্মা হইয়াছেন, আর এক ভাবে ঐ আত্মা হইতেই সর্বভূত হইয়াছেন, সর্বভূতকে নিজের মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছেন। একেবারে পুরুষোত্তমকে তাঁহার সকল ভাবে, সকল তত্ত্বে ধারণা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব বা সহজ নহে। তাই বিভিন্ন দিক দিয়া, বিভিন্ন ভাবে তাঁহার সহিত যোগ অভ্যাস করিতে হয়। পুরুষোত্তম যখন মানবরূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হন তখন তাঁহাতে মন নিবিষ্ট করা সহজ হয়। আমাদের মধ্যে প্রকৃতির সকল খেলার ঊর্দ্ধে যে নীরব নিশ্চল সাক্ষীস্বরূপ আত্মা রহিয়াছে—তাহাতেও মনোনিবেশ করিয়া যোগ অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপ যোগ অভ্যাসের উদ্দেশ্য হইতেছে আত্মশুদ্ধি।

আত্মশুদ্ধি বলিতে শঙ্কর বুঝিয়াছেন অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি। শ্রীধর বলিয়াছেন আত্মার অর্থাৎ মনের বিশুদ্ধতার জন্য এইরূপ যোগসাধনা করিবে। মন, অন্তঃকরণ, চিত্ত এই সব কথা অনেক সময়েই এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গীতা এখানে আত্মশুদ্ধি বলিতে চিত্তশুদ্ধির কথাই বলিতেছে। আত্মা স্বভাবতঃই শুদ্ধ। অহংভাবের বশে আমরা চিত্তের ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি বৃত্তিকেই আমাদের স্বরূপ বলিয়া, আত্মা বলিয়া মনে করি। যখন বুদ্ধি হইতে এই অহংভাব দূর হয়, আমরা আত্মাকে দেহ, প্রাণ, মন ও তাহাদের সমুদয় ক্রিয়া হইতে পৃথক বলিয়া উপলব্ধি করি—তখনই হয় আমাদের চিত্তের বা বুদ্ধির বিশুদ্ধ অবস্থা—তখন আত্মা নিজ স্বরূপে আমাদের নিকট প্রকট হয়, আত্মা যেমন শুদ্ধ বা নিঃসঙ্গ বুদ্ধিও তদ্রূপ হয়। রজঃ ও তমোগুণের বিক্ষেপের জন্যই বুদ্ধি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না—বুদ্ধির রজস্তমোমলশূন্য সত্ত্বস্বরূপে থাকাই বিশুদ্ধাবস্থা, তখন তাহা শুদ্ধতা হেতু পুরুষের সদৃশ হয়। পাতঞ্জল দর্শনে এই কথাই বলা হইয়াছে,

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ।৩।৫৫

অর্থাৎ "বুদ্ধিসত্ত্বের ও পুরুষের শুদ্ধির দ্বারা সাম্য হইলে কৈবল্য হয়।" কিন্তু গীতা এখানে কৈবল্যকে যোগসাধনার উদ্দেশ্য বলে নাই, আত্মশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধিকেই যোগের উদ্দেশ্য বলিয়াছে। সাংখ্য ও রাজযোগের লক্ষ্য যে মোক্ষ বা কৈবল্য, যাহাতে প্রকৃতি অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে, চিত্ত

তাহাতে লীন হইবে, পুরুষের সম্মুখে দৃশ্য জগৎ আর কিছুই থাকিবে না, পুরুষ স্বরূপমাত্রজ্যোতি, অমল ও কেবলী হইবেন—ইহা গীতার লক্ষ্য নহে। গীতার লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞান, ভগবানের সহিত সজ্ঞানে যুক্ত হওয়া, এবং ভগবানের সহিত যুক্ত থাকিয়া দিব্য কর্ম করা, দিব্য অধ্যাত্ম জীবন যাপন করা। সাংখ্য ও রাজযোগ মতের সহিত পার্থক্য করিবার জন্যই গীতা এই অধ্যায়ে কোথাও পুরুষ বা প্রকৃতির উল্লেখ করে নাই, আত্মার কথা বলিয়াছে, চিত্ত, মন, ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছে।

চিত্তকে সকল প্রকার বাসনা কামনা হইতে মুক্ত করা, অহংভাব হইতে মুক্ত করা—ইহাই চিত্তশুদ্ধি। ইহাকেই আত্মশুদ্ধি বলা যায়, যেমন মেঘমুক্ত রবিকে শুদ্ধ বলা যায়। বস্তুতঃ রবি চিরমুক্ত ও শুদ্ধ, কেবল মেঘের দ্বারা ঢাকা পড়িতে পারে, তেমনই আমাদের মধ্যে রজঃ ও তমোগুণ যেমন ক্ষীণ হয়, সত্ত্ব বিকশিত হয়, তখন মেঘমুক্ত রবির ন্যায় আত্মা প্রকাশিত হয়—এবং ইহাই হইতেছে যোগসাধনার লক্ষ্য। চিত্তকে স্থির শান্ত করিবার জন্য গীতা রাজযোগের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে কিন্তু তাহার লক্ষ্যকে, কৈবল্যকে গ্রহণ করে নাই। চিত্তের সহিত প্রাণের ও দেহের নিকট সম্বন্ধ —তাই চিত্তকে স্থির করিতে রাজযোগের আসন ও প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে বলা হইয়াছে। গীতা পঞ্চম অধ্যায়ে প্রাণায়ামের উল্লেখ করিলেও এখানে প্রাণায়ামের উল্লেখ করে নাই। সঙ্কল্প বিকল্প রহিত হইয়া মন একাগ্র হইলেই চিত্ত স্থির বা নিরুদ্ধ হয়—তাই এখানে গীতা মনকে একাগ্র করার উপরেই জোর দিয়াছে।

আধ্যাত্মিকতা বলিতে অনেকেই কতকগুলি নৈতিক নিয়ম পালন বুঝেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, মহাত্মা গান্ধীর মতে আধ্যাত্মিকতা হইতেছে অহিংসা, সত্য, অপরিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য্য পালন। কিন্তু বস্তুতঃ এইগুলি হইতেছে রাজযোগের যমের অন্তর্গত বহিরঙ্গ সাধন। এইগুলিকেই লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করা ভ্রান্তিমূলক। চাই ধ্যান ধারণার অভ্যাসের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞান, চাই যোগসাধনা—তবেই অধ্যাত্ম জীবন লব্ধ হইতে পারে। ইহারই প্রাথমিক প্রয়োজন হিসাবে, চিত্ত মন ইন্দ্রিয়গণকে যতদূর সম্ভব সংযত করিতে হয়, যতচিত্তেন্দ্রিয়ঃ। সাধারণতঃ ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায়, পূজা, উপাসনা, যাগ, যজ্ঞ—এ-সবও বহিরঙ্গ সাধনা। অন্তরঙ্গ সাধনা হইতেছে যোগ—কেবল তাহার দ্বারাই অধ্যাত্ম জীবন লাভ করা যায়। তাই গীতা বলিয়াছে,

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন ।।৬।৪৬